শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেবী

ও

শ্রীমান মাধবলাল ঘোষাল

করকমলেষু

এই লেখকের লেখা—

বধূ বরণ, চির বসন্ত, রায় চৌধুরী, গঙ্গা যমুনা,
শহর থেকে দূরে, চোখে চোখে দেখা, হে মহামরণ,
খরস্রোতা, বাংলার মেয়ে, ঝড়ো হাওয়া,
বিজয়া, অনাথ-আশ্রম, হোমানল,
গ্রামকে গ্রাম, অনাহুত,
শৈলজানন্দের শ্রেষ্ঠ
গল্পসঞ্চয়ন।

সাক্ষি

—এক—

দোলের উৎসব। জমিদারের গৃহপ্রাংগনে যাত্রার আসর বসেছে। আসরের একদিকে সাধারণ দর্শক, শ্রোতা এবং অন্য-দিকে জমিদারের বাড়ীর লোকজন। কয়েকজন মহিলাও চিকের আড়ালে ব'সে আছেন।

একটু পরেই বিপুল গুম্ফ এবং বিকট পরচুলা প'রে প্রাণকেষ্ট আসরে এলো। তখনও পর্যন্ত গোলমাল থামেনি।

প্রাণকেষ্টো অভিনয়ের ভংগীতে আরম্ভ ক'রলেন, বাপ সিন্ধু, কোথা গেলি,—এখনও কি তুই বনানী হ'তে সমিধ সংগ্রহ ক'রে ফিরে আসিস্ নেই—সিন্ধু—বৎস—সিন্ধু···

কিন্তু কে প্রাণকেষ্টোর কথা শোনে! জনতার মধ্য থেকে খাপছাড়া চীৎকার শোনা গেল—এই চুপ কর, চুপ কর—বসো ···চেঁচিয়ে···জোরে জোরে···**louder**···

সেই বিশাল চীৎকার-সমুদ্রের মধ্যে প্রাণকেষ্টোর কথাগুলি বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন আবার প্রোগ্রাম বিলি হচ্ছে—এ বলে, আমায় দাও, ও বলে, ও মশায়, ছুঁড়ুন না ইত্যাদি। চিকের আড়াল থেকে মুখ বার করে একটি মেয়ে বলে উঠ্‌ল, আপনারা বসুন। কতকগুলি প্রোগ্রাম চিকের মধ্যেও গেল।

তবুও সেই গণ্ডগোল, হৈ হৈ কাণ্ড···

একজন লোক একটি বালকের কাছ থেকে একখানা প্রোগ্রাম ছিনিয়ে নিয়ে বললে, দেখি খোকা কিসের পালা—

খোকা বল্‌লে, সিন্ধুমুনি বধ···

লোকটি ভালো ক'রে প্রোগ্রামখানা দেখতে লাগল, তারপর হঠাৎ প্রাণকেষ্টোর দিকে দৃষ্টি পড়তে বল্‌লে, সবই ঠিক আছে হে, কিন্তু ওটা কে?

ওটা অন্ধমুণি—

অন্ধমুণি! রসিকদাসের যাত্রাদলে চিরকাল অন্ধমুণির পার্ট করে আসৃছে আমাদের গাঁয়ের দীননাথ; সে তো সত্যিই কাণা ···acting করে বটে! কিন্তু এ ব্যাটা কে হে? কানা সেজেছে না? হুঁ, দেখছো না চোখ পিট্‌পিট্‌ ক'রছে···

প্রাণকেষ্টোর অবস্থা তখন সংগীন। সত্যিই সে অপদার্থের মতো চোখ পিটপিট কর্‌ছিল। এবার মরিয়া হ'য়ে প্রচণ্ড চীৎকার করে ব'লে উঠলো, বৎস, সিন্ধু, বৎস···

আসরের বাইরে থেকে হঠাৎ কে হাম্বা-হাম্বা রব ক'রে উঠলো। কেউ ব'ল্‌লে, আঃ, চুপ করো।

পূর্বের সেই লোকটি বিরক্তভাবে গা ঝাড়া দিয়ে বল্‌লে, চুপ ক'রবো কি? প্রাণকেষ্টো যদি অন্ধমুণির পার্ট এক্টো করে তো আমি ঢিল ছুঁড়ে মারবো।

আবার প্রাণকেষ্টোর গলা পাওয়া গেল, বৎস সিন্ধু···শীঘ্র শোন···আমি তপস্যাক্লান্ত···তৃষ্ণার্ত···।

সংগে সংগে একজন গাঁজাখোর ধরণের লোক ব'লে উঠ্‌লো, সে কি হে···এখুনি যে গোঁফ সরিয়ে পানের দোকান থেকে চোঁচোঁ করে একটা লেমনেড্‌ খেয়ে এলে!

লোকটির কথায় তখন প্রাণকেষ্টো অন্ধমুণির পার্ট ফেলে রেখে রেগে বলে উঠ্‌ল বেশ করেছি। আমি নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে লেমনেড খেয়েছি তো কার কি!

জনতার মধ্যে তখন হাসির গর্‌রা পড়ে গেছে। গাঁজাখোর লোকটি এগিয়ে এসে ভেংচি কাটার সুরে বল্‌তে লাগল, বৎস সিন্ধু, বৎস···

প্রাণকেষ্টো তখন রাগে কাঁপ্‌চে। একজন ভদ্রলোক গাঁজা-খোরটিকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে গেলেন। ভীড় সরিয়ে যাত্রাদলের অধিকারী রসিকলাল এসে হাজির হ'লো এবং প্রাণ-কেষ্টোকে ঠাণ্ডা ক'রে ব'ললে, প্রাণকেষ্টো, কি ক'রছো? ছিঃ—ছিঃ···চোখ বোঁজ, চোখ বোঁজ।

প্রাণকেষ্টোর পিট্‌পিট্‌ করা চোখদুটি বুঁজে গেলো। রসিকলাল ব'ল্‌লে, বলো তোমার লাইনগুলো: আমি তৃষ্ণার্ত—তুমি অন্ধের আলোক—এস পুত্র—

প্রাণকেষ্টো অনুকরণ করে বল্‌লে, তুমি অন্ধের আলোক—এস পুত্র—কিন্তু সেই লোকটি এবার এক দুঃসাহসিক কাজ করে বস্‌লো। সে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে, আস্‌ছি···এই এলাম বলে··· এবং তারপর হঠাৎ প্রাণকেষ্টোর পরচুলাটি টেনে খুলে ফেল্‌লে। প্রাণকেষ্টো দাড়ী এবং গোঁফজোড়াটি সম্বল করে কেশবিরল মস্তক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। লোকেরা চেঁচিয়ে হেসে উঠলো··· তারপর আরম্ভ হলো যেন এক দৈত্যদানবের লীলা সেই আসরে।

প্রাণকেষ্টো হাত পা ছুঁড়ে বলে উঠলো, যাত্রার নিকুচি করেছে। আমি কি সং না-কি। যাচ্ছি জমিদারবাবুর কাছে···

জনতা থেকে নানারকমের টিটকারী শোনা গেল।

প্রাণকেষ্টো জমিদারবাড়ীর বারন্দায় গিয়ে হাজির। জমিদার-মশায় বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, কি হয়েছে। চুল জটা সব একেবারে খুলে ফেলে দিয়ে···

প্রাণকেষ্টো বল্‌তে লাগলো, আজ্ঞে হ্যাঁ জমিদারবাবু···, আমি তখন ফিলিং দিয়ে এক্টো করছি—একজন গাঁজাখোর এসে জটা তুলে ফেল্লে—

জমিদার বল্‌লেন, বল কি! তুমি ফিলিং দিয়ে এ্যাক্টো করছো, এমন সময় তোমার জটা খুলে দিলে···তুমি একেবারে টাকমাথায়—দাড়ীগোঁফ নিয়ে···কি বিপদ···তা ওটা রেখেছো কেন? গোঁফজোড়াটা খুলে ফেল, খুলে ফেল—এই গণশা খুলেদে···

ভৃত্য গণেশ প্রাণকেষ্টোর গোঁফজোড়া খুলে দিতে গেলে, প্রাণকেষ্টো চেঁচিয়ে উঠলো, এটা আমার নিজের হুজুর, এটা আমার নিজের···

জমিদারমশায় সহাস্যে বল্‌লেন, নিজের! কি বিপদ! তোমার মাথায় একগাছা চুল নেই, গোঁফের অত বাহার কেন বাপু···! তারপর গম্ভীরভাবে বললেন. তা, যাত্রা ভাঙ্গলো কেন? হ্যাঁহে রসিকলাল···

রসিকলাল পাশের লোকগুলির দিকে চাইতে চাইতে বল্‌লে, আজও লোকে এই অন্ধমুণির পার্টের জন্যে দীননাথকে চায়—সে এই পার্টটা খুব ভাল করে হুজুর। সে নিজেও অন্ধ···

তবে! তা তুমি দীননাথকে নিয়ে এলে না কেন? লোকে যখন চায়, তখন···বুঝলে না প্রাণকেষ্টো···

রসিকলাল আমৃতা আমৃতা করে বল্‌লে, তাতো ঠিক হুজুর,

চেষ্টা কি কম করেছি, কিন্তু দীননাথ আসতে চায়না, বলে তার ছেলে এখন কোলকাতার উকিল হয়েচে···মান সম্ভরম···

জমিদারমশায় বুদ্ধিমানের মতো উপদেশ দিলেন, আরে, বুঝিয়ে বল না, বেশী টাকা দেবো ; বেশ তো ওর ছেলেকে Case দেবো, হাইকোর্টের Case. যাও, যাও রসিকলাল, বলো— আমি একটা এতবড় সোনার মেডেল দেবো। ব্যস্, হলো তো ? যাও, তুমি এক্ষুণই দীননাথের গাঁয়ে যাও—এই তো তিনপো রাস্তা,—না হয় আমার ফিটনটা নিয়ে যাও। মোটকথা দীননাথকে বলে কয়ে এখুনি ধরে নিয়ে এস। প্রাণকেষ্টো, তুমি না হয় সংটং সেজে লোকদের একটু ঠাণ্ডা করে রাখ ততক্ষণ, আর দেখ, তোমার গোঁফজোড়াটা বাপু তুমি কামিয়েই ফেলো···

প্রাণকেষ্টোকে অপ্রস্তুত ও বোকার মতো দাঁড় করিয়ে রসিকলাল দীননাথের গ্রামের উদ্দেশে ছুট্‌ল।

রসিকলাল দীননাথের বাড়ীতে এসে তার বক্তব্য বল্‌লে। কিন্তু দীননাথ রাজী হলো না। উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, না যাবো না, তোমার দলে আমি যাবো না। যাবো না—যাবো না। বুঝলে ?

অন্ধ দীননাথ খাটের পায়াতে লেগে হুমড়ি খেতে খেতে সামলে নিলে।

রসিকলাল স্নিগ্ধকণ্ঠে বোঝাতে লাগল, তুমি না গেলে চল্‌বে না দীননাথ, লোকজন হৈ হৈ করছে, গোলমাল থামানো যাচ্ছে না। সবাই বল্‌ছে দীননাথকে চাই।

দীননাথ জবাব দিল, চাইতো পানকিষ্টোকে নিলে কেন ? মারুক্ তোমাকে ধ'রে মারুক সবাই মিলে···। বলেই সে বিছানায় ব'সে পড়লো।

রসিকলাল কৈফিয়ৎ দিল, পানকিষ্টোকে নিলাম কেন ? তুমি বেশ লোক দীননাথ ! বল্‌লে—তোমার ছেলে উকিল হ'য়েছে, যাত্রার দলে গেলে এখন সে তোমার ওপর রাগ করে···তাই তো আমি—

হ্যাঁ, তা মিছে ব'লেছি নাকি ? আমার ছেলে উকিল হয়নি ?

—আরে রেখে দাও তোমার উকিল। এই সেদিন ওকালতি পাশ করলে আর এরই মধ্যে এত বড় উকিল হয়ে গেল যে বাপ যাত্রায় গেলে বাবুর মান ইজ্জৎ সব গেল ! থামো হে থামো···

দীননাথ বল্‌লে, দেখ রসিক ওকালতির তুমি কি জান হে ? হাইকোর্ট দেখেছ কখনও, কোলকাতার হাইকোর্ট ?

দীননাথ দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। রসিকলাল ব্যংগ ক'রে ব'ললে, খুব দেখেছি। কত উকিল ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছে···

দীননাথ মুখঝাপটা দিয়ে উঠ্‌লো, যা জান না, তাই নিয়ে কথা ব'লোনা রসিক। আমার ছেলে কি সে আমি জানি। তুমি যাও আমার বাড়ী থেকে, এখুনি বেরিয়ে যাও···

রসিকলাল কিন্তু নাছোড়বান্দা। দীননাথকে নিয়ে যাওয়ার ওপর তার অনেকখানি মান-সম্ভ্রম নির্ভর করছে। সে শেষচেষ্টা করলে, চেঁচিয়ো না ভাই, চেঁচিয়ো না। শোনো, একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার···

—না, কোনও কথা নয়, তুমি যাও।

—আচ্ছা যাচ্ছি। দাঁড়াও একটু, ছাতাটা নি—বেশ ভাই তাড়িয়ে দিচ্ছ ? কিন্তু জমিদারবাবু কি বল্লেন জান ?

—আমার জেনে দরকার নেই।

জমিদারবাবু বল্লেন, একটা সোনার মেডেল দেবেন···

দীননাথ যেন একটু নরম হোল, হ্যাঁ, বল্লেন অমনি···!

রসিক আরও প্রলোভন দেখালে, বল্লেন, তোমার ছেলেকে কেস দেবেন, হাইকোর্টের কেস।

দীননাথ বল্‌লে, তা তুমি কি বল্‌লে ?

—আমি বল্লাল—হুজুর কেস্‌-টেস্‌ হবে, বরং মেডেলটা একটু···

দীননাথ আবার রেগে গেল, বল্‌লে, বটে ! বেরোও তুমি··· আমি যাব না। কেস্‌-টেস্‌ কি হবে ! যাও বেরিয়ে যাও···

দীননাথ দরজার দিকে এগুতে লাগ্‌লো। রসিকলাল বল্‌লে, আচ্ছা যাচ্ছি। কি বিপদ।

রসিক কিন্তু গেল না।

অন্ধ দীননাথ প্রচণ্ড শব্দ ক'রে দরজা বন্ধ করে দিলে। তখনো তার উত্তেজনা কমেনি। সে বল্‌তে লাগলো, হ্যাঁ, যাও, যাও। আমি দরজা বন্ধ করে দেবো। তুমি আর কখনও আমার বাড়ীতে এস না—কখনও না।

*

এমন সময় দীননাথের প্রতিবেশী জনার্দনের গলা পাওয়া গেলো, দীনুদা, ও দীনুদা !

জনার্দন কি-কাজে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। দীননাথের সদর দরজার সামনে জমিদারের ফিটন-গাড়ী দেখে সে বিস্মিত হলো। তাই ব্যাপারটা খোলসা করে জানবার জন্যে দীননাথের বাড়ী ঢুকে ডাক দিলে, দীনুদা!

কোনো সাড়া নেই!

—দীনুদা, ও দীনুদা!

জনার্দন দীননাথের ঘরের দরজায় টোকা দিতে লাগলো।

দীননাথ একটু পরে দরজা খুলে দিতে জনার্দন অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার? ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে বসে?

ঘরের মধ্যে রসিকলাল তখন গ্যাঁট হয়ে বসে ছিলো। দীননাথ সরল বিশ্বাসে বল্‌লে, আরে বলা কেন ভাই, সেই যাত্রাওয়ালা রসিক, বুঝলে কিনা জনার্দন, বলে কেস্-টেস্ কি হবে—দিলাম তাড়িয়ে, বলে, জমিদার নিজে ডেকে পাঠিয়েছে, মেডেল দেবে—দেখতো কতদূরে গেল? মেডেল!

জনার্দন রসিকের মুখের পানে তাকাতেই রসিকলাল মৃদু হেসে বল্‌লে, একটা বিড়ি-টিড়ি দাও হে দীননাথ!

দীননাথ বিস্মিত হয়ে বল্‌লে, এ্যাঁ তুমি যাওনি?

রসিকলাল আবার মিষ্টি হেসে বল্‌লে, এই তো জিজ্ঞাসা করছিলে, দেখতো কতদূর গেল? চলো, চলো—

—না আমি যাবো না, কক্ষণো না।

কিন্তু ধীরে ধীরে দীননাথের প্রতিজ্ঞা মিইয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। শেষে সে রাজী হলো! কিন্তু পুত্র সুরেশের কথা মনে হতেই কাঁপাগলায় বল্‌লে, কিন্তু যদি সুরেশ···

জনার্দন বল্‌লে, যাও দীননাথ, এতো করে বল্‌ছেন যখন—

—কিন্তু আজ শনিবার, সুরেশ যদি আসে, আর এসে যদি দেখে আমি আবার যাত্রা কর্তে গেছি, তাহলে—কথাগুলো শেষ না করে সে জনার্দনকে লক্ষ্য করে আবার আরম্ভ করলে, তুমি সাম্‌লো বাপু, একদিন তো সে তোমারই জামাই হবে! বলো, আমি ওঘরে ঘুমিয়ে পড়েছি, জ্বর হয়েছে, বড্ড ম্যালেরিয়া, কি বলো? চলো, চলো রসিক, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, মা তারা—

দীননাথ রসিকের কাঁধ ধরে ফিটন গাড়ীর মধ্যে এসে বসলো। গাড়ী জমিদার বাড়ীর উদ্দেশে ছুটে চল্‌লো···

—দুই—

দীননাথ চলে যাবার খানিকক্ষণ পরে স্নটকেশ হাতে নিয়ে স্নরেশ বাড়ী এলো। প্রায় প্রতি শনিবারে সে বাড়ী আসে। আনন্দে প্রায় লাফাতে লাফাতে বাড়ী ঢুকে সামনেই দেখতে পেলে ভৃত্য পশুপতিকে। পশুপতি গদগদ হয়ে বললে, দাদাবাবু, হিঁহিঁ·

স্নরেশ বল্‌লে, হাঁরে, বাবা কোথায় ?

পশুপতি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, কর্তা হিঁ-হিঁ-হিঁ···। হিঁহিঁ করে হাসা পশুপতির মুদ্রাদোষ।

স্নরেশ তখন ডাক্‌লে, মা, ওমা !

রাজলক্ষী মধুর হাসিতে সারা মুখ উজ্বল করে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, ওমা ! কে, স্নরেশ আয়, তবে ব'লেছিলি যে এ শনিবারে আস্‌বি না···

স্নরেশ বললে, হ্যাঁ এলাম। বাবা কোথায় ?

রাজলক্ষী ইতস্ততভাবে বললেন, উনি···

রাজলক্ষী অস্ফুটভাবে কি বল্‌লেন, স্নরেশ বুঝতে পারলে না। সে আবার বল্‌লে, যাত্রার দলে গেছেন বুঝি ?

—হুঁ···।

—তুমি যেতে দিলে ?

রাজলক্ষী ধরাগলায় বল্‌লেন, আমার কথা কেউ শোনে নাকি—তুই শুনিস ?

—কেন, শুনি না ?

হ্যাঁ শুনিস্ !

স্বরেশ বল্‌তে লাগল, মা, এতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। আমি হাইকোর্টের উকিল। আমি চাই না, আমার বাবা যাত্রার দলে যাত্রা করতে যান। তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মানুষ করে দিয়েছেন; এখন আমি রোজগার করব—আমি তোমাদের খাওয়াব, আমি তোমাদের মান-ইজ্জৎ বাড়াবো—এখন হতে তোমার, বাবার সমস্ত দায়িত্ব আমার···

রাজলক্ষ্মী ছেলের কথায় মনে মনে অপার আনন্দ লাভ করলেন।

※

খুব ভোরবেলা। জনার্দনের গলা থেকে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী গানের সুর ভেসে আসছে। স্বরেশ ও রাজলক্ষ্মী এই সংগে বাইরে কোনো গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দ পেলেন। রাজলক্ষ্মী মাথার উপর ঘোমটা তুলে দিলেন। দীননাথের উৎফুল্ল স্বর শুন্‌তে পাওয়া গেল, জনার্দন, জনার্দন—আরে এদিকে, এদিকে। রসিকলাল তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি···

জনার্দন ঐ গানটি গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে কাছে এলে দীননাথ আবার বল্‌লে, আরে রাখ তোমার দুর্গতিনাশিনী। মেডেল দেখেছ ? এই দেখ, কত বড়···আর এই বিশটা টাকা। দীননাথ জনার্দনের সামনে ধরলে।

সুরেশ আর সেখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সে তৎক্ষণাৎ পশুপতির হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। পশুপতির কণ্ঠের ক্ষীণ প্রতিবাদ অন্ধ দীননাথকে চকিত করে দিলে। দীননাথ জিজ্ঞাসা করলে কে ?

জনার্দন উত্তর দিলে, ও পশুরাজ !

—ও, তাই ভালো। সে আসেনি তো ? সুরেশ ?

জনার্দন বললে, এসেছে।

দীননাথের স্বর কেঁপে গেল, এসেছে—তা-কি বল্লে···

—কি আর বলবে, রাগ কর্তে লাগলো···

—রাগ করবে কেন ? তুমি বল্লেনা—আমি ঘুমুচ্ছি···বড্ড জ্বর, ম্যালেরিয়া···

অন্ধ দীননাথ কাতর হ'য়ে পড়লো। সুরেশ ডাকলে, বাবা !

—কে সুরেশ···ভালো আছিস্ তো ? যে ঠাণ্ডা পড়েছে··· উঃ···দীননাথ মেডেল এবং টাকা কয়টি লুকোবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সুরেশ অকম্পিত স্বরে প্রশ্ন করলে, কেন আপনি আবার গিয়েছিলেন যাত্রার দলে ?

দীননাথ অক্ষম কৈফিয়তের সুরে বলতে লাগলো, রসিকলাল যে জোর করে নিয়ে গেল বাবা, যেতে তো আমি চাই নি। ও রসিক, বল না। আর বলাবলিরই-বা কি আছে ! ক্ষতিই বা কি করেছি, হ্যাঁ জনার্দন, আজকালকার দিনে বিশটা টাকা···

সুরেশ বললে, টাকা ! মানসম্ভ্রমের চেয়ে টাকাটাই আপনার বেশী হলো ?

দীননাথের দীর্ঘশ্বাসের সংগে দুটি কথা বেরিয়ে এলো, মান-সম্ভ্রম !

সুরেশ সংগে সংগে বল্‌লে, হ্যাঁ, যাত্রাদলে যারা গান গায়, বক্তৃতা করে, তাদের কেউ সম্মান দেয় না।

দীননাথ গম্ভীর হয়ে গেল। বল্‌লে, চুপ কর সুরেশ। আর সব নিন্দে সইতে পারি আমি যাত্রার নিন্দে সইতে পারি না। মানসম্ভ্রম ? জানিস্ তোদের হাইকোর্টের উকিলের চেয়ে তারা বেশী সম্মান দেয় আমায়। জমিদারবাবু পর্যন্ত কত খাতির করলো আমাকে তা জানিস্ ?

সুরেশ বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, আপনি সেই খাতির নিয়ে থাকুন, আমি চল্লাম। সুরেশ যাবার জন্যে একটু অগ্রসর হলো।

দীননাথ তার কথার উত্তর দিলে, তাই যা বাবা যা। সারারাত যাত্রা করে তোর সংগে আমি আর চীৎকার করতে পারছি না ! তারপর আবেগ-কম্পিত স্বরে বললে, এই যাত্রাগান করে রোজগার করেই আমি তোকে পড়িয়েছি, তোকে আজ এতবড় করে তুলেছি, জানিস্ ?

যাবার পথে সুরেশ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে জবাব দিলে, বড় করেছেন বলেই কি আজ ছোট করে দিতে চাচ্ছেন ? বলে সে চলে গেল।

রাজলক্ষ্মী ডাক্‌লেন, সুরেশ !

সুরেশ শুধু একবার পিছনে চেয়ে বললে, মা···। আর কিছু না বলে চলে গেল। রাজলক্ষ্মী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করলেন, দুর্গা, দুর্গা···।

*

ক্রমে দিনের আলো ফুটে উঠল। দীননাথ লাঠিতে ভর দিয়ে এগুতে এগুতে নিজের মনেই কথা কইছিল। বাগানের মধ্যে লতানে গাছের পাতাগুলো ফুরফুর করে দুলছিল।

—হুঁ, চলে গেল তো বড় বয়ে গেল! কোথা হে জনার্দন ভায়া—·

—এস, এস—জনার্দন দীননাথের ডাকে সাড়া দিল।

—এস কি! মেয়ের বাপ হয়ে দিব্যি গলা ছেড়ে গান গেয়ে বেড়াচ্ছ! কেন, বিয়েটা দিয়েই ফেলো না, দেখছো না আজকালকার ছেলেদের কিরকম মান সম্মান জ্ঞান!

জনার্দন উত্তর দিলে, আমি তো তোমার মুখের দিকে চেয়েই আছি ভাই! সাত বছর হলো বাণীর মা স্বর্গে গেছে; সে জেনে গেছে তুমি বাণীকে তোমার ঘরে তুলে নিয়েছ।

—একশোবার নিয়েছি। তুমি তো দেরী করছ। বেশ কালই! অর্থাৎ কাল মানে এই মাসেই। দেখ পাঁজী দেখ···

জনার্দন ধীরে ধীরে বল্‌লে, সুরেশকে একবার জিজ্ঞাসা করাটা···

দীননাথ যেন জনার্দনের কথাটা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারে নি এমনি ভাবে বল্‌লে, সুরেশ-কে? কেন? যার বিয়ে সে কি পাঁজী দেখবে নাকি? তবে হ্যাঁ—ছুটি। হাইকোর্টে তার রোজই কেস্ কিনা···দ্যাখ জনার্দন, তাহলে মনের কথাটা খুলেই বলি··· ব'লে খুব সাবধানতা সহকারে বল্‌তে লাগলো, সুরেশ ঠিকই বলেছে—হাইকোর্টের উকিলের বাপের যাত্রাগান করা ঠিক নয়—বুঝলে···

তা যাত্রাগান ছেড়ে দাও না কেন ?

—ছেড়ে দেবো ! আচ্ছা বেশ ! সর্বস্ব বন্দক রেখে সুরেশকে পড়ালাম—জানাতো চক্কোত্তি-বুড়োকে ? উঃ সুদের সুদ ! যাত্রা ছেড়ে দেবো, এঁ্যা ? বলি, তোমার মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে চাও নাকি হে, আচ্ছা বাপ তো ?

জনার্দন কৃতজ্ঞতা সহকারে বললে, এমন শ্বশুর থাক্তে আর বাপের দরকার কি বলো ? কিন্তু সুরেশ তো আজকাল বেশ পয়সা আনে।

—আনবে না কেনো ? যখনই আসে, টাকা আনে কিন্তু আমি এখন ওর পয়সা নেবো না। ওর কত খরচ জানো ? বড় বড় বই, চাঁদা পত্তর, কোট-প্যাণ্টুলুন,—সব ভালো ভালো হওয়া চাই। সাহেবদের মাঝে মাঝে ভোজ দিতে হয়—নইলে কি আর বড় হওয়া যায় হে ?

একটু হেসে বললে, সেদিন বুঝলে জনার্দন, সুরেশের মা বলছিল,—সুরেশ কোলকাতায় কি পেট ভরে খাস্ না, রোগা হয়ে গেছিস্ ? সুরেশ হেসেই খুন। বল্লে—দিন কতবার করে সে খায়। ঐ যে কি বলে ডিনার. লাঞ্চো ! এঁ্যা ? আর কোথায় থাকে জানো, মস্তবড় হোটেল। নামটা হচ্ছে···আঃ মনেও থাকে না ছাই, বল নাহে জনার্দন ! মনে পড়েছে—গ্রাণ্ডো—গ্রাণ্ডো—হুঁ্যা গ্রাণ্ডো ইষ্টার্ণ হোটেল—

দুই বন্ধুর প্রাণে আনন্দের জোয়ার খেলে গেল ! একটু দূরে ফাঁক করা দরজা থেকে বাণীর সলজ্জ হাস্যমুখর মুখখানি সরে গেল।

—তিন—

দীননাথের 'গ্রাণ্ডোইষ্টার্ণ হোটেল' অর্থাৎ সুরেশের গ্র্যাণ্ড-ইষ্টার্ণ হোটেল কলকাতার একটি অপরিসর রাস্তার ওপর নিজের কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। সত্যিই বাড়ীখানি আজ পর্যন্ত যে দাঁড়িয়ে আছে কি করে, তা ভাব্তে গেলে মাথা গুলিয়ে যায়। বাড়ীর বাইরেটি যেমন, ভিতরটিও প্রায় তেমনি। বাড়ীর মধ্যে ঢুকলে মনে হবে একটা পাগলা-গারদ। সবচেয়ে বেশী কৌতুহল উদ্রেক করে তান্ত্রিকাচার্য্য পণ্ডিত শশিশেখর জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের 'অল ইণ্ডিয়া ম্যারেজ বুরো'। সেখানে রয়েছে তান্ত্রিকাচার্য্য এবং তাঁর সাকরেদ হরিমোহন।

হোটেলের ম্যানেজার এসে এই বিখ্যাত বুরোর দরজায় টোকা মারলেন। বোঝাবার দরকার নেই, তিনি তাঁর পাওনা টাকা নিতে এসেছেন্। ফুরুক করে একটি জানালা খুলে গেল এবং শ্রীমুখ বার করলে হরিমোহন। ম্যানেজার কিছু বলবার আগেই হরিমোহন হিস-হিস শব্দ করে বললে, চুপ, চুপ!

ম্যানেজার অবাক্! কেন কি হয়েছে?

—তান্ত্রিকাচার্য্য ধ্যানে বসেছেন!

—এঃ, টাকা চাইতেই ধ্যানে বসেছেন! খোল, খোল···

দরজায় উপর্যুপরি টোকা মারার শব্দ শুনে স্বয়ং তান্ত্রিকাচার্যের টনক্ নড়লো বোধহয়। তিনি ম্যানেজারবাবুকে কৃতার্থ করে সাড়া দিলেন, কে?—একটু পরে আস্‌বেন, আমি এখন পূজো ছেড়ে উঠতে পারব না।

বলা বাহুল্য ধার্ম্মিক প্রবর তান্ত্রিকাচার্য শশিশেখর বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে টাকার হিসাব করছিলেন ঘরে খিল এঁটে। ম্যানেজার কি মনে করে বল্‌লেন, আচ্ছা আপনার পূজো হলে খপর দেবেন। আমি ম্যানেজারবাবু···

ম্যানেজার এইবার আর-একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজার ওপর প্লেটে লেখা—সুরেশচন্দ্রমুখোপাধ্যায়এম-এ,বি-এল।

এ্যাডভোকেট

হাইকোর্ট, কলিকাতা।

ম্যানেজার প্লেটের ওপর থেকে outটা সরিয়ে inটা এঁটে দিয়ে ডাকলেন, সুরেশবাবু!

সুরেশ জুতো পালিশ কর্‌তে কর্‌তে ভিতর থেকে সাড়া দিলে, দরজা খোলাই আছে ম্যানেজারবাবু। ম্যানেজার সোজা চলে এসে সুরেশের বিছানার ধারে একখানা কার্ড ঝুলিয়ে দিলেন। তাকে লেখা :—মিল ষ্টপ।—বাকি সতেরো টাকা তেরো আনা। সুরেশ মুখ কাঁচুমাচু করে বল্‌লে, ওটা তুলে নিয়ে যান ম্যানেজারবাবু, সবাই দেখবে···

ম্যা: —এইটে আমাদের হোটেলের রুল,—টাকা দিন, তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

বিনা সুরেশ বিনতিপূর্ণ স্বরে জানালে, টাকাটা দিনকতক পরে—

ম্যানেজার একটু শ্লেষের সংগে বললেন, আজ্ঞে না। হোটেলের টাকা দিতে পারেন না, কি ওকালতি করছেন? আপনি ইরিয়ে শশিশেখরের বিবাহ-সমিতির একটা মকর্দমা করলেন সেদিন, টাকা পেলেন না?

কো —কিছু পেয়েছিলাম, তাতে একটা কোট কিনতে হলো···

—তাহ'লে কোর্টই কিনুন। আজ থেকে মিল্ ষ্টপ, আর দশদিন গেলে পুলিশের নোটিশ। বলে ম্যানেজারমশায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, হাঁ মশাই, তিনি কোথায়, সেই ইনস্যুয়োর বাবু! রোজ যার লাখটাকা রোজগার!

ম্যানেজার আর একটি বিছানার ধারে গেলেন। একটু দাঁড়িয়ে বিছানার চাদরখানা তুলতেই দেখলেন, সেই ইনস্যুয়োর-বাবু মুখে সাবান মেখে, ক্ষুর হাতে নিয়ে শুয়ে আছেন। বুঝতে পারলেন দাড়ি কামাতে কামাতে লুকোবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। লোকটি অত্যন্ত অপমানিত হ'য়ে একটু হেসে জীবনের দুঃখের কথা জানিয়ে দিলে। ম্যানেজার শুধু ব'ললেন, বেশ, বেশ—সুন্দর ঠকাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন…

লোকটি পাষাণের মতো বসে রইলো। ম্যানেজারমশায় চ'লে গেলেন।

কিন্তু সুরেশ আজ অত্যন্ত অপমানিত বোধ ক'রলে নিজে ওনা সে জুতো পালিশ করা রেখে সোজা গিয়ে হাজির হ'লো তান্ত্রিকাচার্য শশিশেখরের ঘরে। শশিশেখর তখন সবে ম্যারার সেরেছেন। সুরেশ প্রশ্ন ক'রলে, হরিমোহনবাবু কোথায় গে

—কি প্রয়োজন? নে

—আমার দশটা টাকা বাকি আছে।

শশিশেখর অবজ্ঞার ভান ক'রে ব'ললেন, কিসের টাকা? …

—সেই যে বস্তির মেয়ের সংগে বামুনের ছেলের হো-দিয়েছিলেন! সেই মকর্দমায় আমি উকিল ছিলাম। ঐর্থ

শশিশেখর টপ করে প্রশ্ন করলেন, আপনাকে কত টান দেওয়া হ'য়েছে?

—তিনটাকা রোজ, পাঁচদিন মকর্দমা চলেছিল ; পনের টাকার মধ্যে পাঁচটাকা পেয়েছি—বাকি দশ টাকা…

শশিশেখর সুরেশের কথায় বাধা দিয়ে বিজ্ঞের মত ব'ললেন, কিছু বাকি নেই ! গ্রাণ্ড ইস্টার্ণ হোটেলে থাকেন, ট্রামে চড়ে কোর্টে যান, দৈনিক একটাকা ; পাঁচদিনে পাঁচটাকা। ব্যস… ওরে আমার পাঁজিটা…

সুরেশ রেগে গিয়ে ব'লে উঠলো, আপনি আমার টাকা দেবেন কি না, বলুন !

শশিশেখর ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে ব'ললে, মহাশয়ের ক্রোধ রিপুটি অত্যন্ত প্রবল দেখ্‌ছি…বয়োধর্ম ! হাঁ—মহাশয়ের নাম ?

—সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

—বিবাহ হয়েছে ?

সুরেশ বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে না। আপনার তাতে ?

আবার শশিশেখরের মুখে এক টুক্‌রো হাসি ফুটে উঠ্‌লো, আমার তাতে দরকার বই কি ; বিবাহ হয় নি মুখোপাধ্যায়, ভরদ্বাজ গোত্র, কুলে মেলে নিশ্চয়ই,…

এইবার সুরেশ রেগে উত্তর দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আমার বিবাহের জন্যে আমি আসিনি। আমার টাকা দিন, দশটাকা…

শশিশেখর মিটমিট করে হাস্‌তে লাগলেন। তিনি লোক চেনেন। ধীরে ধীরে নবাবী কায়দায় ডাক্‌লেন, হরিমোহন, হরি-মোহন !

হরিমোহন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে এলো। শশিশেখর কেটে কেটে বল্‌তে লাগলেন, ভরদ্বাজ গোত্র, অবিবাহিত উকিল, টাকা

অভাবে ভদ্রলোকের প্র্যাকটিস্ জমছে না, আর তুমি কি না, ওঁর দশটা টাকা মেরে দিয়েছো! ছিঃ-ছিঃ—দিয়ে দাও এক্ষুনি। আচ্ছা, আমার ডিপার্টমেণ্ট থেকে না হয় দিয়ে দিচ্ছি; এ্যাডভোকেট ফিস্ বলে খরচ লিখে নিয়ো।

তারপর এক-দুই-তিন ক'রে সুরেশের হাতে দশটা টাকা গুণে দিয়ে শশিশেখর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, হলো তো? হ্যাঁ, আর একটা কথা, আদালত থেকে ফিরে এসেই আমার সংগে দেখা করবেন; আপনাকে আমাদের বাঁধা উকিল করে নেবো। হরিমোহনবাবুর দয়ায় আমাদের মামলার অভাব নেই,—বামুনের বিয়ে দিচ্ছে বগ্যির সংগে, বগ্যির বিয়ে কায়েতের সংগে—কানা, খোঁড়া, পাগল, কুচ্ছিৎ,—কোনো মেয়েই বাদ পড়ে না,—আপনি আস্‌বেন!

সুরেশ বাঁচলো তাঁর কথা শেষ হতে। বল্‌লে নিশ্চয়ই আসবো, নমস্কার। বলে সে বেরিয়ে গেল। শশিশেখর হরিমোহনকে বল্‌লেন, হরে, এমনি করে তুই ব্যবসা করবি? এমন পাত্র তুই হাতছাড়া করলি কি রকম?

হরিমোহন ঠোঁট উল্‌টে, চোখ বড় করে বল্‌লে, কি পাত্তর! পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, ম্যালেরিয়ার ডিপো, সামান্য মেটে বাড়ী, তাও দেনায় সব বাঁধা। কানা বাপ, যাত্রার দলে এক্টো করে ঘুরে বেড়ায়...

শশিশেখর হরিমোহনের কথা শেষ হ'তে না হ'তে মাথা ঝাঁকিয়ে বল্‌লেন, আলবাৎ বেড়াবে। ছেলে হাইকোর্টের উকিল, বাপ রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াতে পারে। এই ছেলের সংগে রায়বাহাদুরের মেয়ের বিয়ের যোগাড় দেখ্......

—ওরে বাবা ! সে মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না ! বিশটা সম্বন্ধ পাঠিয়েছিলাম। দশজন মার খেয়ে ফিরে এসেছে।

শশিশেখর সবটা জান্‌তে চাইলেন, কে মারলে ? দরওয়ান ?

—আরে দরওয়ান কেন, মারধোর করেন পাত্রী স্বয়ং। কেউ গেলে, ক'নে নিজেই উপস্থিত হন হাতে হাণ্টার নিয়ে। প্রশ্ন করেন—কি চাই ? তারপর উত্তর দিতে না দিতেই সপাং···

শশিশেখর হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন। তারপর গদগদ-ভাবে বল্‌তে লাগ্‌লেন, জয় মা রণরংগিনী ! হরিমোহন, এই হলো মায়ের চামুণ্ডারূপ ! আমি আজই উকিলবাবুকে নিয়ে যাব রায়বাহাদুরের বাড়ীতে।

সন্ধ্যা হয় হয়। শশিশেখর সুরেশকে নিয়ে রায়বাহাদুর বি, এল, ব্যানার্জীর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রবেশ করলেন। সুরেশ দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইলো। শশিশেখর খানিক পরে রায়বাহাদুরের সংগে অন্য একখানা ঘরে ঢুকলেন। রায়বাহাদুর বসে বল্‌লেন, তারপর ব্যাপার কি ?

শশিশেখর আমতা আমতা করে বল্‌লেন, আর একটা সম্বন্ধ···

—আপনারা তো অনেক সম্বন্ধ এনেছিলেন, একটাও তো টেঁকাতে পারলেন না !

—আজ্ঞে এই রকম ভালো সম্বন্ধ আস্‌বে বলেই সেগুলো টেঁকেনি। ছেলেটি হাইকোর্টের উকিল, দেখতে শুন্‌তে রাজপুত্তুর···

রায়বাহাদুর বল্‌লেন, তাহলে তো ভালোই দেখছি···

কিন্তু তাঁর কথা আর শেষ হ'লো না। সেই সময় ওপর

থেকে কাঁচ-ভাঙ্গার বিকট খন্‌খন্‌ ঝন্‌ঝন শব্দ ভেসে এলো, তার সংগে রায়বাহাদুরের মেয়ে রেখার উত্তেজিত তিরস্কার···

রায়বাহাদুর এবং শশিশেখর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রেখা তখন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামছিল আর তার সামনে সামনে টাইগার। রায়বাহাদুর ডাকলেন, খুকী, কি হয়েছে খুকী···? রেখা রাগে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলো, টাইগার আমার **dance** নষ্ট করে দিলে—**broute**—পাজি—শয়তান···

রায়বাহাদুর ও শশিশেখর চলে গেলেন। রেখা রাগের মাথায় একটা ফুলের বালতিতেই লাথি মেরে বস্‌লো।

সুরেশ ফুলের বালতিটা তুলে রেখে দিলে যথাস্থানে। এইবার রেখা সুরেশকে দেখতে পেলে। সুর বদলে তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রশ্ন করলে, এই মরেছে, এ আবার কেরে? **Who are you?** কে তুমি, কি দেখছো দাঁড়িয়ে, যাও—**get out, get out**···বলে সে ওপরে উঠে গেলো!

সুরেশ একখানা চেয়ারে বসে পড়লো। বেয়ারা এক পেয়ালা চা তার হাতে এনে দিলে। সে চুমুক দিতে লাগলো! পাশে চাইতে দেখলো, টাইগার দরজার ফাঁকে উঁকি মারছে। সে তাকে ডাকলে আদরসূচক শব্দ করে। টাইগার এসে তার পায়ের গোড়ায় ল্যাজ নাড়তে লাগলো।

এদিকে রেখা আবার নীচে নাম্‌ছে। সিঁড়ির কাঠে তার জুতো লেগে আওয়াজ হচ্ছে খট্‌-খট্‌! রেখা সামনে আবার সুরেশকে দেখে বলে উঠলো, এখনো দাঁড়িয়ে এখানে! কেরে লোকটা! কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিলে কেন? টাইগার তখন সুরেশের কাছ থেকে চলে গিয়েছিল।

সুরেশ সহজভাবে জবাব দিলে, আমার মনে হয়, আপনিই কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন···

বটে! আবার **lecture** দেয়রে! বেশ করেছি, তাড়িয়ে দিয়েছি। আমার কুকুর, আমি যা খুসী তাই করবো, তোমার কি? তুমি কি চাও এখানে?

সুরেশ তেমনি স্বাভাবিককণ্ঠে বল্‌লে, আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে আসিনি!

ছেলেমানুষী রাগে রেখা ফেটে পড়ল, ওরে! তবে কার কাছে আসা হয়েছে, শুনি?

—রায় বাহাদুরের কাছে।

—রায়বাহাদুর আমারই বাবা।

সুরেশ নির্লিপ্তভাবে বল্‌লেন, আশ্চর্য!

রেখা আবার গর্জে উঠ্‌লো, আশ্চর্য মানে? এই মরেছে! আবার আশ্চর্য্য বলেরে! আশ্চর্য মানে? ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না—আমি খুকি, না?

সুরেশ একটু রসিকতা করার লোভ ছাড়তে না পেরে গম্ভীর ভাবে বললে, মনে হয় রায়বাহাদুর ঐ নামেই আপনাকে ডাকলেন···

রেখা আরও জ্বলে উঠলো। তারপর টাইগারকে ডাক্‌তে লাগলো। টাইগার ঘরে ঢুকতে, সুরেশের দিকে লেলিয়ে দিলে। কিন্তু টাইগার সুরেশের পায়ের গোড়ায় গিয়ে বশ্যতা স্বীকার করলে। রেখা বার বার বলতে লাগলো, টাইগার···ইস্···টাইগার···। সুরেশ তখন টাইগারকে আদর করছিল।

টাইগার রেখার কোনো আদেশই পালন করলো না। তখন

রেখা চীৎকার করে ডাক্‌লে, লছমী ! লছমী ! লছমী তার দাসী। লছমী এলে রেখা তাকে হাণ্টারটা আন্‌তে বললে ; কিন্তু হাণ্টার আনার পর, সেটা হাতে নিয়ে রেখা লছমীর হাতের ওপর এক ঘা দিয়ে দুমদাম করতে করতে ওপরে চলে গেলো। সুরেশ মুচ্‌কি হাস্‌লে।

অন্যদিকে শশিশেখর আর রায়বাহাদুরের কথা প্রায় শেষ হয়েই এসেছিল। রায়বাহাদুর বললেন, ছেলেটি ঘর-জামাই থাক্‌তে রাজী হবে তো ?'

শশিশেখর ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন, আজ্ঞে সে ভার আমার। যদি জামাই করতে পারি, তাহলে ঘর-জামাইও করতে পারবো। তবে একটা কথা হুজুর !

রায়বাহাদুর গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, কি কথা বলুন !

শশিশেখর গলার স্বর মৃদু করে বল্‌তে লাগ্‌লেন, দেখুন ছেলেটির সংগে এখনই বিয়ের কথা চল্‌বে না। তাকে বল্‌তে হবে আপনি তাকে হাইকোর্টের Case দেবেন।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, তার মানে ? বিয়ের কথা না বলে হাইকোর্টে Case দেবার আলোচনা করতে হবে কেন ?

শশিখেরের মুখে মোলায়েম হাসি ফুটে উঠ্‌লো। তিনি হাস্‌তে হাস্‌তেই বল্‌লেন, সে-কথা পরে জানবেন কিংবা আপনার জানবার দরকারই নেই। শুধু আমায় বিশ্বাস করে আপনাকে এই মিথ্যাচারটুকু করতে হবে। মিথ্যাচার মানে ঠিক সত্যাচার নয়—

রায়বাহাদুর ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌লেন, কিন্তু…

—কিন্তু নয়। জানবেন, আপনার মেয়ের বিয়ে দিতেই

হবে একদিন। এখন এমন একটা পাত্তর পাওয়া গেছে···ভেবে দেখুন খেলিয়ে তুল্‌তে হবে। তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি আপনার অমংগল করবো না। এই আপনার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

রায়বাহাদুর একটু ভেবে শশিশেখরের কথায় সায় দিয়ে বল্‌লেন, আচ্ছা তাই হবে। আপনি শুধু এইটুকু জেনে রাখুন যে আমার মেয়েকে আমি কোনদিনই শ্বশুর বাড়ী পাঠাতে পারবো না। আর আমার জামাইকে সর্বদা চেষ্টা করতে হবে আমার মেয়েকে সুখী করবার জন্যে। আমার মেয়ের বিরুদ্ধে আমি কোনও দিন যাইনি···আমার জামাইও যাবে না কোনদিন,—এই সর্ত—**condition···**

শশিশেখর একমুখ হেসে বল্‌লেন, সে সব ঠিক হবে। আচ্ছা তবে আসি, নমস্কার !

—নমস্কার।

শশিশেখর রায়বাহাদুরের ঘর থেকে বেরিয়ে চিন্তারত সুরেশের গায়ে ঠেলা দিয়ে বল্‌লেন, চলুন।

—চার—

রায়বাহাদুরের বাড়ী থেকে ফিরে এসে সুরেশ তার একমাত্র আরামের সম্বল বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিলে। তার মাথাটা চক্কর খেতে লাগ্‌লো। রায়বাহাদুরের বাড়ীর ঘটনাগুলোকে সে মনে করতে চেষ্টা করলে। রেখার কথা মনে হতেই সে হেসে উঠ্‌লো আপন মনে। ও কি রকমের মেয়ে ? সুরেশ রেখার ব্যবহারকে ছেলেমানুষীর পর্য্যায়ে স্থান দিতে শত চেষ্টা করেও দিতে পারলে না ; সে স্থির করলে রেখা অসভ্য—আর তার বাবা ? যাইহোক্ আদরেরও একটা সীমা আছে ! প্রশ্রয় দেওয়া কখনোই ভালো নয়—কিন্তু···তার চিন্তা হঠাৎ একটা পথে বেঁকে গেলো। সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো কেন শশিশেখর তাকে রারবাহাদুরের বাড়ী নিয়ে গেলেন ? আশ্চর্য্য ! তার মনে পড়লো শশিশেখর তাকে বলেছেন রায়বাহাদুর তাকে হাইকোর্টের Case দেবেন ! কিন্তু কেসই বা কোথায়, আর······

তার চিন্তায় আবার বাধা পড়লো এবং সুরেশ দেখ্‌লে ঘরের দরজা খুলে প্রবেশ করছেন শশিশেখর। সে কোনো প্রশ্ন করবার আগেই শশিশেখর বললেন, এই যে, এসেই শুয়ে পড়েছেন !

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বেগার খাটাবার কি দরকার ছিল বলুন তো ?

শশিশেখর মুচকি হেসে বল্‌লেন, রাগবেন না সুরেশবাবু, ভেতরে নিশ্চয়ই একটা গূঢ় রহস্য আছে ; তা নইলে আমিই বা কেন নিয়ে যাবো আপনাকে সেখানে ?

—কিন্তু Case...

—সে সব ধীরে ধীরে আসবে। একদিন গিয়েই অমনি হবে ? বেশ লোক তো! বলে শশিশেখর সুরেশের কাছে এসে খপ করে সুরেশের ডানহাতের চেটোটা তাঁর মুখের সামনে তুলে ধরলেন। সুরেশ বিস্ময়ে হতবাক্! শশিশেখর গম্ভীরভাবে বললেন, জয় মা দুর্গা! আপনার হাতে সোনা ফলছে, সোনা একেবারে সোনা!

সুরেশ জড়িতস্বরে বললে, তার মানে ?

—তার মানে আবার কি, এ একেবারে নির্ঘাত জয়। জয় মা তারা! সুরেশবাবু চলুন তো আমার ঘরে। ভগবানকে ধন্যবাদ এমন একখানা হাত দেখবার জন্যে পেয়েছি। আসুন, আসুন, সুরেশবাবু, এ এক ইম্পোর্টেন্টো (mporlant) হাত... বলে শশিশেখর সুরেশের হাত ধরে টানতে টানতে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর একখানা মাদুরের ওপর বসে সুরেশের ডানহাতের চেটোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তাঁর মুখ থেকে ধীরে-সুস্থে কতকগুলি কথা বেরুল, হুঁ কন্‌ডিসন্! কন্‌ডিসন্ মানে ?

—সুরেশ বললে, Condition মানে সর্ত।

—সর্ত মানে ?

—সর্ত মানে Condition।

শশিশেখর বললেন, ঠিক হয়েছে। একেবারে ঠিক। তারপর সুরেশের হাত ছেড়ে দিয়ে ভালোভাবে বসে বললেন, কি জানতে চান ?

সুরেশ বিরক্তভাবে বললে, কিচ্ছু না।

—কিচ্ছু না? সে কি হয়? এতে লজ্জার কি আছে? বলুন কি জানতে চান?

সুরেশ একটু হেসে বললে, আপনি কি বলতে পারে

—পারাপারি প্রশ্ন পরে। বলুন না, অতীত জা না ভবিষ্যৎ?

সুরেশ ঠাট্টা করে বললে, আগে অতীতটাই বলুন, আপনাদের শাস্ত্রে আগে বিশ্বাসী হই, তারপর···

শশিশেখর আরম্ভ করলেন, হুঁ শুনুন। আপনার বাবা অন্ধ!

—সে তো মেসের কেউ-কেউ জানে বোধ হয়।

শশিশেখর আরও গম্ভীরস্বরে বললেন, আপনার মায়ের কঠিন পিত্তশূল ব্যাধি—

—হ্যাঁ, খুব serious হয় মাঝে মাঝে।

তান্ত্রিকাচার্য্য আবার আরম্ভ করলেন, দেনার দায়ে আপনাদের বিষয়-সম্পত্তি, জমি-জামাত যায়, বসত-বাড়ী পর্য্যন্ত বন্ধক।

সুরেশ সরলভাবে বললে, এটা যে ভুল হলো। সামান্য একটা দেনার কথা মায়ের মুখে শুনেছিলাম কিন্তু বাবা তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন—

—বাবা হেসে ওড়াতে পারেন, কিন্তু এখানে, বলে শশিশেখর সুরেশের হাতের চেটোর ওপর আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে বললেন যে, চোখের জলে লেখা রয়েছে।—আরও শুনুন, ভয় পাবেন না তো?

সুরেশ বললে, না, বলুন।

শশিশেখর গলাটা অস্বাভাবিক ভরাট করে বলতে লাগলেন, এই দেনার জন্য বোধ হয় আপনার বাবা···

—কি, বলুন ?

—হয় হার্টফেল করে মারা যাবেন, আর নয়তো আত্মহত্যা করবেন।

সুরেশ রেগে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি বলতে চান, হাত দেখে আপনি এইসব বলতে পারেন ?

শশিশেখর মৃদু হেসে বললেন, চটবেন না। আপনি শুনতে চেয়েছিলেন, তাই বললাম। বিশ্বাস করা, না করা আপনার অভিরুচি !—হরিমোহন, আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করো। তারা তারা···তাহলে আজ আসুন। কাল বৈকালে কোর্ট থেকে এসে রায়বাহাদুরের কাছে আবার যেতে হবে। এ্যাপয়েণ্টমেণ্টো করে এসেছি···

সুরেশ অস্বীকারের ভংগীতে জানালে, না, আমি ওখানে কাল যেতে পারবো না। আমি, কালকেই বাড়ী যাচ্ছি,—আমার দেশে। আপনি রায়বাহাদুরকে বলে দেবেন—

সুরেশ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শশিশেখর চারিদিকে চেয়ে একবার বললেন, রাত্রি বেশ ঘনিয়ে এলো। আমার সন্ধ্যে-আহ্নিক। ও হরিমোহন, এই হরে !

হরিমোহন ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে তিনি বললেন, ঠিক বলেছি তো, না তুই আবার ভুল খবর এনেছিলি—

হরিমোহন একটু চটে বললে, ভুল খবর ? দু'বার গেছি আমি ওদের দেশে। সব লিখে এনেছি। এই দেখ বাংলা-দেশের সব মুখুজ্জেদের ইতিহাস—বলে সে এক লম্বা খাতা শশিশেখরের সামনে ধরলে। শশিশেখর ধ্যাননিমীলিত চোখে বললেন, জয় মা তারা !

*

পরদিন সুরেশ দেশে চলে গেলো।

—গ্রামের মাথায় সূর্য্য তখনও ঢলে পড়েনি, কিন্তু বিশেষ দেরী নেই অস্ত যাবার। রাজলক্ষ্মী তাঁর নিজের হাতেগড়া বাগানটির মধ্যে তুলসীবেদীর মূলে প্রার্থনা করছিলেন। এমন সময় দীননাথ লাঠি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে প্রবেশ করলো সেখানে। রাজলক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেন—দেখলেন স্বামীর আনন্দ উপচে পড়ছে। দীননাথ ডাক্‌লেন, গিন্নি, কোথায় গেলে ?

রাজলক্ষ্মী সাড়া দিলেন।

গিন্নি, দিন ঠিক করে এলাম পঁচিশে ফাল্গুন বিয়ে, তেইশে গায়ে হলুদ—ব্যস্‌, ছেলের বিয়ে দিয়ে এইবার চলো কাশী যাই —তুমি আমি জনার্দন···জয় বাবা বিশ্বনাথ···

রাজলক্ষ্মী বল্‌লেন, বিশ্বনাথের জয় হোক—কিন্তু দিন ঠিক করে এলে কি গো ? সুরেশকে একবার জানাও, তাকে একবার লেখো···

দীননাথ চট্‌ করে জবাব দিলে, লেখ মানে ? জনার্দনকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে বেন্দা পিওনের হাতে সেটা দিয়ে, তাকে চার আনা বিয়ের-বকশিস্‌ দিয়ে তবে আস্‌ছি। শীগ্‌গীর জোগাড়-যন্তর করো গিন্নি, আর ক'দিন বাদে ছেলের বিয়ে। কেমন ? মুখে হাসি যে ধরে না দেখছি, এ্যাঁ ?

রাজলক্ষ্মী স্বামীর কথায় মধুরভাবে হাস্‌ছিলেন। দীননাথ আরো কিছু বল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় ভৃত্য পশুপতি ডাক্‌লে, কর্তা···!

দীননাথ সাড়া দিলে, কে ? পশু ? দাদাবাবুর বিয়েতে তোর কি চাই বল্‌ ? লাল সিল্কের পাঞ্জাবী, এ্যাঁ ?

পশুপতি আবার বল্‌লে, কর্তা এসেছে···

দীননাথ কপাল গুটিয়ে বল্‌লে, কে ? নবীন চক্কোতি ? এই সেরেছে—শুভকাজে আবার চক্কোত্তি কেন ? কোথায় সে ?···

এই যে সামনে···

দীননাথ বল্‌লে, আসুন আসুন চক্কোত্তি মশাই—ওরে বৈঠকখানা খুলে দে···তামাক দে, তামাক।

রাজলক্ষ্মী মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন।

নবীন চক্রবর্ত্তী বল্‌লে, তামাক আমার হাতেই আছে। বৈঠকখানা খোলবার দরকার নেই, বরং তুমিই একবার আমার বৈঠকখানায় এসো এখুনি, বুঝলে ?

নবীন চক্রবর্ত্তী রূপোদিয়ে বাঁধানো হুঁকোয় টান দিলে। দীননাথ নবীনের বৈঠকখানায় এলো ? একটা গ্রাম্য পথের ঠিক ধারেই সেই ঘর। নবান চক্রবর্ত্তী ঘরের দালানের ওপর দাঁড়িয়ে বল্‌লে, আর কতদিন ভোগাবে বলতো তুমি ?

দীননাথ মিনতির সুরে বল্‌লে, আর একটু অপেক্ষা করো ভাই। নবীন হুঁকোয় আর একটা টান দিয়ে বল্‌তে লাগলো, কেবল অপেক্ষা আর অপেক্ষা ? শোনো দীননাথ, এতোদিন তোমার ভিটেমাটি উচ্ছনে দিইনি কেন জান ? ভেবেছিলাম তোমার সুবুদ্ধি হবে···কোনও বড়লোকের মেয়ের সংগে ছেলের বিয়ে দিয়ে হয়তো আমার দেনাটা শোধ করতে পারবে।—তাই আমি মাসের পর মাস অপেক্ষা করছিলাম। এখন আমি কি করব তোমার ওই ভাঙা বাড়ী আর পড়ো জমি নিয়ে ! তুমি ভুলে গেছ তোমার আমি কি উপকার করেছিলাম—

দীননাথ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বল্‌লে, সে কি! তা কি ভোলা যায়! আপনি দয়া করে মাসের পর মাস টাকা দিয়েছিলেন, তাইতো আমি ছেলেকে হাইকোর্টের উকিল করতে পেরেছি—

নবীন বিশ্রী গলায় ব'ল্‌লে, তোমার কাজতো গুছিয়েছো, এখন আমার টাকা?

দীননাথ অত্যন্ত কোমলভাবে ব'ললে, সুরেশ রোজগার করছে, সে এইবার শোধ দেবে—

—কবে?

—তা...।

নবীন ফট্‌ ক'রে বল্‌লে, দীননাথ, তুমি আমায় ঠকাতে চাও?

বৃদ্ধ, অন্ধ দীননাথ মর্মাহত হ'য়ে হাত নাড়তে নাড়তে বল্‌লে, আজ্ঞে না, না, আমি পৈতে ছুঁয়ে বলছি, ঠকাবার ইচ্ছা আমার কোনদিন হয়নি, কোনদিন হবেও না। আমি জনার্দনকে কথা দিয়েছি আজ নয়, দশ বছর আগে, যখন ওর স্ত্রী মারা গেল। তা ছাড়া, চক্কোত্তি মশাই, আমি আপনার দেনার জন্যে কোনও বড়লোকের কাছে আমার ছেলেকে বিক্রি করতে পারবো না—কখনও না—কোনদিনই না—

সুরেশ এই সময় বাড়ী যাচ্ছিল; সে সবে সহর থেকে এসেছে। পথের ধারে উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে সে থম্‌কে দাঁড়াল এবং একটু পরে বুঝতে পারলে তার বাবার গলার আওয়াজ। সে একটা দেওয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে সব শোনা যায়, অপরের অলক্ষ্যে। দীননাথের শেষের কথাগুলো তার কানে গিয়েছিলো। সে আবার শুনলে নবীন

চক্রবর্তী বল্‌ছে, তোমার পুত্রস্নেহ খুব গভীর দেখছি···এইবার তোমার ছেলের পিতৃভক্তি কত গভীর দেখি। তাকেই তাহলে লিখে পাঠাই, পিতৃঋণ শোধ না করে হাইকোর্টে গেলে, তার বাপকে হয়তো পুলিশ কোর্টে-ই যেতে হবে।

দীননাথ কাতরকণ্ঠে ব'ল্‌লে, না না চক্কোত্তি মশাই, এ-কাজ করবেন না। আমি এতদিন তাকে বলিনি। আমার দেনা আছে শুনলে, সে না খেয়ে, একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়ে আমায় পাঠাবে। তাতে তার খাওয়া হবে না, ভাল ভাবে থাকা হবে না, ভাল উকিল হওয়া হবে না—তার সব নষ্ট হ'য়ে যাবে। আপনার দেনা আমি শোধ করব—আমি রোজ যাত্রার দলে যাবো—

নবীন চক্রবর্তী বাইরে এলো। দীননাথও একটু একটু ক'রে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে বাইরে চ'লে এলো। সুরেশের সঙ্গে নবীনের চোখোচোখি হ'লো। তারপর নবীন দীননাথের প্রস্তাবের উত্তর দিলে, আচ্ছা তাই হবে। ব'লে সে চ'লে গেলো।

দীননাথ আবেগ কম্পিত স্বরে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, বাঁচলাম, বাঁচলাম, চক্কোত্তি-মশাই—আমি আমার বুকের রক্ত দিয়ে আপনার দেনা শোধ করব। কিন্তু সুরেশকে কিছু জানাবেন না, তাকে মানুষ হ'তে দিন···তাকে বাঁচিয়ে রাখুন···

দীননাথ উত্তেজিত অবস্থায় ভগবানকে কিংবা নবীনকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে হাত তুল্‌তে, আচমকা লাঠিটা তার হাত থেকে প'ড়ে গেল। সে হেঁট হ'য়ে খুঁজতে চেষ্টা ক'রলে। সুরেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে লাঠিটা বাবার হাতে তুলে দিলে।

দীননাথ ডাকলে, কে? কে?

সুরেশ ব'লতে চেষ্টা ক'রলে 'আমি' কিন্তু তা না ব'লে সেখান

থেকে ছুটে চ'লে গেল। দীননাথ চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, কে, কে আমার হাতে লাঠি তুলে দিলে···কে তুমি,···কে ?

বৃদ্ধের চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে জল প'ড়ছে।

সুরেশ দৌড়ে এসে মায়ের পাশে অসহায়ের মতো ব'সে পড়ে ব'ল্‌লে মা, তোমায় একটা কথার উত্তর আজ দিতেই হবে।

রাজলক্ষ্মী ধীরভাবে ব'ল্‌লেন, কিসের উত্তর ?

—আমাদের খুব বেশী দেনা আছে কি না বল তো ?

—আছে।

সুরেশ একটু চুপ করে থেকে বললে, মা, তুমি আমায় এতদিন বলনি কেন ?

রাজলক্ষ্মী নতমুখে ব'ল্‌লেন, উনি বারণ ক'রে দিয়েছিলেন—

—আচ্ছা মা, দেনা কতো ?

—ঠিক তো আমি জানি না সুরেশ !

—তবু—

রাজলক্ষ্মী কাতরভাবে বল্‌লেন, সুদে আসলে বোধহয় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা !

সুরেশ চম্‌কে উঠে ব'ল্‌লে, সাড়ে পাঁচ ! সে মাকে আর কিছু ব'ল্‌তে যাচ্ছিল ; শুন্‌লে তার বাবা বাড়ী ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্‌ছেন, ওরে পশু, বিছানাটা পেতে দে না···শরীরটা হঠাৎ কি রকম খারাপ হ'য়ে উঠলো।

দীননাথ সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারছিল না। পশুপতি, রাজলক্ষ্মী, সুরেশ তাকে গিয়ে ধ'রতে দীননাথ আবার বল্‌লে, বড্ড শরীর খারাপ করছে···

রাজলক্ষ্মী ভয়ার্তকণ্ঠে বল্‌লেন, হঠাৎ শরীর কেন খারাপ হ'লো ? ম্যালেরিয়া নয় তো ?

দীননাথ সকলের সাহায্যে বৈঠকখানা ঘরের দিকে এগুতে এগুতে বল্‌লে, না, না, জ্বর-টর নয়। বুকটা কি রকম ক'রে উঠ্‌লো, নবীন চক্কোত্তির সঙ্গে কথা কইবার পরই—উঃ !

দীননাথ বুকে হাত চেপে ঘরে ঢুকে বিছানায় ব'সে প'ড়লো। সুরেশ বাবার পাশে ব'সে ব'ল্‌লে, আপনি শুয়ে পড়ুন—বিছানা থেকে উঠ্‌বেন না, আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।

দীননাথ সুরেশের গলা পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌তে লাগ্‌লো, কে সুরেশ ! কখন এলে ? ভাল আছো তো ? —আমি বেশ ভালই আছি বুঝলে ? এ-সময় একটু ম্যালেরিয়া আর হবে না ? ডাক্তার কি হবে, পাগল আর কি ! যাও, যাও, মুখ হাত ধুয়ে নাও, জলটল খাও—তারপর রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করে বললে, শুন্‌ছো—কোথায় যে যাও, সুরেশ বাড়ী এসেছে, তাও তোমার খেয়াল নেই···। পশু···

দীননাথ চ'লে প'ড়লো। সুরেশ ত্রস্তকণ্ঠে বল্‌লে, পশু, শিগ্‌গীর যা, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়—

পশুপতি চ'লে গেলো।

খানিকক্ষন পরে সে ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। রাজলক্ষ্মী ভিতরে চ'লে গেলেন। ডাক্তারবাবু রোগীর পরীক্ষা সেরে বল্‌লেন, কেস্‌টা যেনো সিরিয়স্ মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এই ওষুধটা আনুন। এখন হয়তো অনেক দাম নেবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি—

সুরেশ বল্‌লে, ডাক্তারবাবু আমি আজ রাতের গাড়ীতেই

ক'লকাতা যাবো ; কাল সন্ধ্যার মধ্যেই আমি আপনাকে ওষুধটা এনে দেবো—হ্যাঁ, কত দাম প'ড়বে আন্দাজ ?

ডাক্তারবাবু হিসেব ক'রতে ক'রতে বললেন, তা কি ক'রে বল্‌বো ? বাজার যে রকম···

স্থরেশ তখুনি উঠে বল্‌লে, যে-দামই হোক্ আমায় ওষুধ আন্‌তেই হবে।

তারপর ডাক্তারবাবুকে ভিজিটের টাকা দিয়ে কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা ক'রতে লেগে গেল। ভয়ার্ত রাজলক্ষ্মীকে সে সান্ত্বনা দিলে।

সন্ধ্যা হয়-হয়। আর একঘণ্টা পরেই ট্রেণ !

স্থরেশ ঘরের মধ্যে হু'একবার উত্তেজিতভাবে পায়চারী ক'রলে। কি করা যায় ? কে জানে কত দাম চাইবে ওষুধের !

একসময় সে বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে ষ্টেশনের দিকে।

—পাঁচ—

সুরেশ গভীর রাত্রে মেসে এসে, কোনো রকমে দরজা ঠেঙিয়ে নিজের ঘরে ঢুক্‌লো। তার ঘরের বন্ধু চোখ রগড়াতে রগড়াতে ব'ল্‌লে, কিরে, এমন অসময় ?

সুরেশ দু' এক কথায় তাকে বাবার অসুখের সংবাদটা শুনিয়ে দিলে। তারপর আলো নিভিয়ে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লো। এলোমেলো চিন্তায় সুরেশের মন ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো।

সারাটা রাত্রি সুরেশের বিনিদ্রায় কাটলো।

বেলা একটু বাড়তেই সুরেশ প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্‌খানা নিয়ে ওষুধের দোকানে গেল। কিন্তু ঘুরে ঘুরে কেবল একটি জায়গায় সে ওষুধ পাওয়া গেল। দাম অসম্ভব বেশী। দোকানী জানালে বাহাত্তর টাকা লাগবে।

সুরেশ মেসে ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লো। বাহাত্তর টাকা! কোথায় পাবে সে, কে দেবে? কিন্তু ওষুধ তো চাই-ই··· তার ওপর নির্ভর করছে তার বাবার জীবন। কিন্তু টাকা কোথায় ?

সুরেশ তাড়াতাড়ি ক'রে উঠে সরাসরি শশিশেখরের কাছে গিয়ে তার অবস্থা জানিয়ে বাহাত্তর টাকা ধার চাইলে। শশিশেখর চোখদুটো কপালে তুলে ব'ল্‌লেন, বাহা-ত্তর টাকা! কে ধার দেবে? পাগল! এ-বাজারে বাহাত্তর-টা পয়সা কেউ ধার দিতে পারে না—জানেন ?

সুরেশ তবুও কাতরভাবে বল্‌লে, কিন্তু আমার যে চাই এখুনি। গ্রামের ডাক্তারবাবু যে সব ওষুধ লিখে দিয়েছেন, সারা ক'লকাতা খুঁজে মাত্র একটা ডাক্তারখানায় পেয়েছি। বাহাত্তর টাকা দাম পড়বে বলেছে। এখুনি যদি না যাই, তা-ও পাবো না।

হঠাৎ শশিশেখর বল্‌লেন, চলুন রায়বাহাদুরের কাছে। দেখি একবার কপাল ঠুকে।

মুখে উৎসাহের আলো ফুটালেও শশিশেখর মনের মধ্যে একটা মতলব ভাঁজলেন। সুরেশ বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে, রায়বাহাদুর! তাঁর case করলাম না; তিনি শুধু শুধু আমায় টাকা ধার দেবেন কেন?

শশিশেখর হাত নেড়ে বল্‌লেন, শুধু শুধু মানে! আর ধারই বা কেন? অগ্রিম দেয়—এ্যাড্‌ভ্যানসো। চলুন; হরিমোহন, কেউ এলে বলো আমার অন্য ইম্‌পর্টেণ্টো এ্যাপয়েণ্টমেণ্টো আছে…। তিনি সুরেশকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসে ছাতাটা কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লেন, মা, এইবার কৃপা করো, মা…!

*

রায়বাহাদুরের বাড়ীতে এসে শশিশেখর সুরেশকে সামনের হলঘরে দাঁড় করিয়ে রেখে রায়বাহাদুরের বৈঠকখানায় গেলেন। তারপর মিনিটদশেক পরে বেরিয়ে এসে সুরেশকে বল্‌লেন, যান! সব ব্যবস্থা করে এলাম—রায়বাহাদুর আপনার জন্যে চেক্ বই নিয়ে ব'সে আছেন—যান—দুর্গা, দুর্গা!

সুরেশ আশায় বুক বেঁধে পরদা সরিয়ে রায়বাহাদুরের ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে নমস্কার জানালে।

রায়ববাহাদুর প্রশ্ন করলেন, তুমি টাকা চাও ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পরে শোধ দেবো।

রায়বাহাদুর ধীরে সুস্থে বল্‌লেন, দেখো তোমায় টাকা দিতে পারি এক সর্তে।

—বলুন, আপনার সর্তটা কি !

—আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, আর সেজন্য আমি তোমাকে···

সুরেশ বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে বল্‌লে, বিয়ে···!

—হ্যাঁ। আর সেজন্যে তোমায় দশহাজার টাকা দেবো।

সুরেশ জোর গলায় বল্‌লে, এই হীনপন্থায় আপনি আমাকে কিন্‌তে চান ? ছিঃ—বলে সে বেরিয়ে এলো বাইরে। এসে দেখ্‌লে শশিশেখর বিড়ি খাচ্ছে। সে প্রায় ধমক দিয়ে বল্‌লে, এই আপনার হাইকোর্টের Case পাইয়ে দেওয়া। রায়বাহাদুর চেক নিয়ে বসে আছেন ! তিনি আমায় দশহাজার টাকা দিয়ে কিন্‌তে চান্‌ তাঁর উন্মাদ মেয়ের জন্যে ! সব আপনার কারসাজী !

শশিশেখর বিরক্ত শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই ! অযাচিতভাবে আপনার উপকার করেছি—কারসাজী নয়। এই যে বলছিলেন, আপনার বাবার জন্যে আপনি সব করতে পারেন—যান্‌ ওষুধ কিনে নিয়ে যান—

সুরেশ আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে বল্‌লে, নিশ্চয়ই যাবো ;—আমার এই ঘড়ি, সোনার বোতাম—

শশিশেখর ভেংচি কেটে ব'ল্‌লেন, ও! আর বুঝি ওষুধ লাগ্‌বে না? এক ওষুধেই আপনার বাপের রোগ সেরে যাবে, না? পরে সুরেশের মুখের কাছে সরে এসে নিষ্ঠুর-ভাবে বল্‌লেন, তারপর নবীন চক্কোত্তির পাঁচ হাজার টাকা দেনা? ওষুধে কি হবে—দেনার দায়েই যে বাপের হার্টফেল হচ্ছে!

সুরেশ বল্‌লে, আপনি শয়তান!

শশিশেখর সে-কথা গায়েও মাখ্‌লেন না। সুরেশ ভাবতে লাগ্‌লো টাকা পাবার এই শেষ পথ—আর…আর, টাকা না হ'লে তার বাবার প্রাণও বাঁচবে না! সে সংকল্প করলে তার সব কিছু দিয়েও সে বাবাকে রক্ষা করবে! সে আবার রায়বাহাদুরের ঘরে ঢুকে গেলো। গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, আমি আপনার সর্তে রাজী। আপনি যা বল্‌বেন আমি তাই করবো!

রায়বাহাদুর একবারের জন্যে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, আমার আর সর্তগুলো জেনে রাখো। আমার মেয়ের বা আমার মতের বিরুদ্ধে তুমি কিছু করবে না। আমার মেয়েকে তুমি সর্বদা সুখী রাখবার চেষ্টা করবে। আর আমার ঘরজামাই হ'য়ে থাকৃতে হবে। কেমন রাজী?

সুরেশ যন্ত্রচালিতের মতো বল্‌লে, রাজী, যা বলবেন তাতেই রাজী!

রায়বাহাদুর একখানা দশহাজর টাকার চেক্ কেটে সই ক'রে সুরেশের হাতে দিলেন। সুরেশ টল্‌তে টল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

*

সেইদিনই চেক্ ভাঙিয়ে ওষুধ নিয়ে সুরেশ বাড়ী এলো। তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে নবীন চক্রবর্তীর বাড়ীতে ঢুকলো। নবীন তখন তামাক টানছিলো।

সুরেশ এক এক করে সব টাকা তার হাতে গুণে দিলে:

—এই পাঁচ হাজার দুশো—এই ত্রিশ—এই তিন—হ'লো তো পাঁচ হাজার দুশো তেত্রিশ টাকা? সুদে, আসলে আপনার শোধ হল; এবার দিন মরগেজ, দলিল, হাতচিঠি...

নবীন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললে, এই যে, আমি সব ready রেখেছিলাম; এই নাও। সুরেশ সেগুলো হাতে নিলে। নবীন আবার প্রশ্ন করলে, একটা কথা জিজ্ঞেস করি বাবাজী! এতো মবলগ্ টাকা হঠাৎ পেলে কোথায়? হাইকোর্টে না কি?

সুরেশ অত্যন্ত রূঢ়ভাবে জবাব দিলে, যেখান থেকেই হোক্, আপনি তো পেয়েছেন। দু'হাজার টাকা ধার দিয়ে পাঁচ হাজার পেয়েছেন। কৌতূহল প্রকাশটা আর নাই বা করলেন।

সুরেশ সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে হনহন করে এগিয়ে চল্‌লো।

বাড়ী পৌঁছে সে রাজলক্ষ্মীকে ঋণশোধের কথা জানালে। তারপর বাবাকেও জানালে সে-কথা। দীননাথ আনন্দে অধির হয়ে বল্‌তে লাগলো, তুমি,—তুমি, সব শোধ করে দিয়েছো? এই ক' বছরে তুমি এতোটাকা জমিয়েছো! ওগো শুনছো—

রাজলক্ষ্মী গেলাসে ওষুধ নিয়ে এসে বল্‌লেন, শুনেছি, এবার ওষুধটা খেয়ে ফেলো।

দীননাথ হেসে বল্‌লে, ওষুধ,—ওষুধ আর দরকার নেই—ওষুধ এই, এই দলিল, হ্যাণ্ডনোট। বলে সে সুরেশের হাত থেকে দলিলগুলো নিলে। তারপর আবার আরম্ভ করলে, আমার অসুখ বুকে নয়, বুঝ্‌লে? অসুখ ওই নবীন চক্কোত্তি। সে-ই আমায় মারছিলো। সুরেশ বাঁচিয়েছে, আমার সুরেশ···

বলে দীননাথ সুরেশকে জাপ্‌টে ধরলে! সুরেশ পিতার পাশে বসে কেবল ভাবছিলো যদি এঁরা জান্‌তেন কি করে সে-টাকা সে পেয়েছে।

সেই সময় জনার্দন একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে প্রবেশ করলে। জনার্দন ডাকলে, দীনুদা! রাজলক্ষ্মী মাথায় ঘোমটা টেনে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

দীননাথ সাড়া দিলে, কে? জনার্দন! এসো এদিকে। তোমার ভাবা জামাইয়ের কাণ্ডটা একবার শোনো! এই ক' বছরে পাঁচহাজার টাকা—হ্যাঁ দেখ সুরেশ···

সুরেশ বল্‌লে, কি বলছেন?

দীননাথ পুনরায় বলে চল্‌লো, তোমায় বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম। এই পঁচিশে ফাল্গুন তোমার বিয়ে, আমাদের বাণীর সঙ্গে,—জনার্দনের মেয়ে বাণী। তুমি তখন ছোট ছিলে, বাণীর মা যখন স্বর্গে যায়, তখন আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমায় এতদিন স্পষ্ট কিছু বলিনি—আমি জানতাম—আমি যখনই বল্‌বো, তুমি বুঝবে যে তোমার বাবা বাক্‌দান করেছে···

সুরেশ ঢোক গিলে বল্‌লে, আপনার শরীর এখন সুস্থ নয়…

দীননাথ স্বচ্ছন্দভাবে বল্‌লে, সুস্থ নয়! বাঃ! আমার শরীর আমি জানি না? তারপর মিষ্টি গলায় বলে উঠল, জনার্দন, ভাবছো মেয়ের বিয়ের খরচ কমাবে;—গয়নাপত্তর না দাও ক্ষতি নেই কিন্তু সানাই চাই বাপু—আমার এক ছেলে, সানাই চাই—

জনার্দন আহ্লাদে গদগদ হয়ে বল্‌লে, সানাই হবে বইকি, এ কি কম আনন্দের দিন, দীনুদা!

সুরেশের মুখের ওপর বর্ষার মেঘ ঘনিয়ে এলো। সে কি বল্‌বে? একবার ভাবলে বলেই দেয় যে এ-বিবাহ অসম্ভব কিন্তু কে যেনো তার সব কথা-বলার শক্তি হরণ করে নিলে! সুরেশ হাঁ করে চেয়ে রইলো তার বাবা আর জনার্দনের হাস্যমধুর মুখের দিকে!

দীননাথ জনার্দনের কাঁধে হাত রেখে বল্‌লে, তাহলে ভাই এই আস্‌ছে বুধবার আশীর্বাদের দিন ধার্য হলো, কি বলো?

হ্যাঁ দীনুদা, তাই ঠিক হলো। এবার তুমি একটু বিশ্রাম করো, আমি যাই। জনার্দন চলে যেতে রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করলেন। এসে ডাকলেন, শুন্‌ছো!

দীননাথ হাস্‌তে হাসতে বল্‌লে, কি বল্‌বে তুমি?

রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত মৃদুস্বরে বল্‌লেন, আশীর্বাদের দিনটা আর একটু পিছিয়ে দিলে হতো না?

দীননাথ একটু বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, আঃ গিন্নি, তোমার আবার পিছোবার ইচ্ছা কেন, যা হয় আগিয়েই হোক্‌…জয় বাবা বিশ্বনাথ!

*

রাজলক্ষ্মী জোড় হাতে দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তারপর, আসবে আসবে করে এসে গেল আশীর্বাদের দিন।

বাণীদের বাড়ীতে আজ আনন্দ আর ধরে না। একখানি ঘরে বসে কয়েকজন বিবাহিতা মহিলা এবং বাণীর সঙ্গীরা তাকে সাজিয়ে দিচ্ছিলো। কেউ তার মুখে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিচ্ছিলেন, কেউ তার কাপড়ের ভাঁজটি ঠিক করে দিচ্ছিলেন।

এমন সময় বাইরে দীননাথ এসে হাজির। জনার্দন বল্‌লে, এসো দাদা এসো—কইরে তোদের হলো ? আশীর্বাদের যে সময় হয়ে গেলোরে—এসো দীনুদা—কইরে বাজা না শাঁক—

দীননাথ জনার্দনের হাত ধরে এগিয়ে চললো। শাঁখ বেজে উঠলো। দীননাথ জনার্দনের কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লে, কি আনন্দের দিন জনার্দন—এ যে···

কথা শেষ হবার আগেই একজন পিওন ডাকলে, জনার্দন ঠাকুর।

জনার্দন পিছন ফিরে বল্‌লে, কে ?

—আমি পিওন। আপনার নামে টেলিগ্রাম—

জনার্দন হন্তদন্ত হয়ে বললে, টেলিগ্রাম, আমার নামে ?···কে দিলে···দাও—

তখন শাঁখের শব্দ কেঁপে কেঁপে বাতাসে মিশে যাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে বাণীকে নিয়ে উল্লাসের অবধি নেই। কিন্তু

টেলিগ্রাম পড়া শেষ হবার পর জনার্দনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে চীৎকার করে বলে উঠলো, ওরে থামা, থামা!

দীননাথ কৌতুহলের সুরে বল্‌লে, কেন? কি হলো?

জনার্দন অত্যন্ত করুণভাবে জানালে, সুরেশ টেলিগ্রাম করেছে—

দীননাথ চমকে উঠে বল্‌লে, সুরেশ? কেন! ভালো আছে তো? কি লিখেছে জনার্দন?...

জনার্দন কোনও রকমে বল্‌লে, লিখেছে, সে আস্‌তে পারবে না—আর...আর...

আর কি?

—আর, সে বাণীকে বিয়ে করতে পারবে না।

সমস্ত হাসির হিল্লোল ও আনন্দের গুঞ্জন এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলো। দীননাথ একবার নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলে। তারপর জনার্দনের হাত ধরে চেঁচিয়ে বল্‌লে, জনার্দন, জনার্দন, তা হয় না! তাকে আসতেই হবে—তাকে বাণীকে বিয়ে করতেই হবে। চলো, আমি তাকে নিয়ে আস্‌ছি। তুমি আমায় কলকাতায় নিয়ে চলো, এই চারটের গাড়ীতে চলো...তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে আবার বল্‌লে, ওরে, তোরা শাঁখ বাজা, আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, বাজা শাঁখ।

বৃদ্ধ দীননাথ কাঁপতে কাঁপতে জনার্দনের হাত ধরে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জনার্দনের তখন চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল ঝর্‌ছে।

আর ওদিকে বাণা, তার কি হ'লো? সে এতক্ষণ নতমুখে থেকে এক ফাঁকে রাজলক্ষ্মীর বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে কান্নায় ফেটে পড়ল।

*

সেইদিন সন্ধ্যার একটু পরেই দীননাথ জনার্দনকে নিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছল। খোঁজাখুঁজির পর, অতি কষ্টে গ্র্যাণ্ড ইস্টার্ণ হোটেল পাওয়া গেল, কিন্তু সুরেশ কোথায়? জনার্দন দেখলে মেসও প্রায় খালি!

একটু পরে মেসের একজন চাকরের সঙ্গে জনার্দনের দেখা হলো। জনার্দন সুরেশের খোঁজ চাইলে, সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, ও উকিলবাবুর কথা বল্‌চেন?

দীননাথ মাথা নেড়ে জানালে, হ্যাঁ, হ্যাঁ···আমি তারই বাবা!

চাকরটি একটু অপ্রতিভ হলো; তারপর বল্‌লে, আজ যে তাঁর বিয়ে!

দীননাথ চমকে উঠলো, বিয়ে, কার সঙ্গে তার বিয়ে?

—আজ্ঞে রায়বাহাদুরের মেয়ের সঙ্গে, এখানে তো সবাই জানে—শুধু আপনিই জানেন না দেখছি; তাছাড়া আপনি ওঁর বাপ···

দীননাথ ধম্‌কে উঠে বল্‌লে, আমি কেউ না। বল্‌তে পারো রায়বাহাদুরের বাড়ীর ঠিকানা?

—আজ্ঞে, সে ঠিকানা তো সকলেই জানে! এই এখান থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা!

চাকরটি ঠিকানা জানিয়ে দিলে জনার্দন খুঁজে নিলে রায়-বাহাদুরের বাড়ী। তারা প্রবেশ পথের সামনে এসেই শুনতে পেলে শাঁকের আওয়াজ আর তার সঙ্গে সানাইয়ের মিলন-

রাগিনী। দীননাথ জনার্দনকে বল্‌লে, শিগ্‌গীর আমায় নিয়ে চলো ভেতরে জনার্দন—শিগ্‌গীর—

দীননাথ জনার্দনের হাত দৃঢ়ভাবে ধরে, লাঠি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে হল ঘরের মধ্যে ঢুকতে চাইলে কিন্তু শশিশেখর (শশিশেখর, তান্ত্রিকাচার্য হলেও, সে আজকের দ্বার-রক্ষক!) তাকে আট্‌কালে। কিছুতেই ছাড়ে না—

দীননাথ জোরে জোরে বল্‌তে লাগলো, আঃ ছেড়ে দিন। কোথায় সুরেশ, সুরেশ কই?…

শশিশেখর হেঁকে বললে, সরুন মশাই, বিয়ে বাড়ীতে আপনি হাঙ্গামা করতে এলেন! বললাম—সুরেশবাবুর বিয়ে হয়ে গেছে—

দীননাথ তার কথা গ্রাহ্য না করে প্রায় এক রকম জোর করেই জনার্দনকে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলে। তারপর বললে, কক্‌খনো তার বিয়ে হয়নি—তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। মিথ্যাবাদী —জুয়াচোর—সুরেশ কোথায়? জনার্দন সুরেশকে ডাকো।

হলঘরের মধ্যে নববিবাহিত সুরেশ স্ত্রী রেখাকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের এই মাত্র বিয়ে হয়েছে। মাথায় টোপর, মুখে চন্দনবিন্দুর সমারোহ…

জনার্দন দীননাথকে বল্‌লে, সুরেশ সামনেই দাঁড়িয়ে আছে—পাশে তার বউ—বিয়ে হ'য়ে গেছে!

দীননাথ ফেটে পড়লো, বিয়ে হয়ে গেছে। সুরেশ! সে চীৎকার করে সুরেশকে ডাকলে।

সুরেশ অসহায়ভাবে বল্‌লে, আপনি কেন এখানে এলেন?

দীননাথ কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিলে, কেন এলাম, সে আমি বুঝবো। তুমি উত্তর দাও, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে কি না?…

সুরেশ ধীরভাবে উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

দীননাথ পাগলের মত বল্‌লে, ব্যস! ব্যস!—জনার্দন চলে এসো—চলে এসো—

দীননাথ জনার্দনকে টেনে নিয়ে চল্‌লো। পাশ থেকে রায়-বাহাদুর বল্‌লেন, শুনুন—আপনি-সুরেশের বাপ?

দীননাথ কারও কথা শুন্‌লে না। জনার্দনের হাতের উপরি-ভাগটা ধরে কেবল বল্‌লে, না, আমি কেউ নয়—সুরেশের আমি কেউ নয়, সুরেশ আমার কেউ নয়—জনার্দন চলো—

দীননাথ জনার্দনকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। তখনো সানাইয়ের মধুর বাজনা বেজে চলেছে। এই অবিরাম আনন্দ স্রোতধারার মধ্যে সুরেশ ও রেখা ওপরে বাসর ঘরে যাবার জন্যে সিঁড়িতে পা দিলে এবং তাদের সঙ্গে চলল একদল ছেলে মেয়ে! আর···

*

দীনদাথ ও জনার্দন হেঁটে চল্‌লো।

জনার্দন কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে এগুতে লাগলো। এ যে তার স্বপ্নেরও অতীত! জীবনের কি বিভীষিকা! দীননাথ কেবল ভাবতে লাগলো তারই হাতে-গড়া সুরেশ এতোবড় অবাধ্য হতে পারে! এতোবড় অবাধ্য! না, সুরেশ তার কেউ নয়—সে তার বাবার সম্মান নষ্ট করেছে—সুরেশ মারা গেছে···! বৃদ্ধ চম্‌কে উঠ্‌লো, এ কি ভাব্‌ছে সে? কিন্তু···সুরেশ তার কেউ নয়—না, না, কেউ নয়।

তারা চল্‌তে চলতে একটা চওড়া রাস্তার ধারে এসে পৌঁছল। জনার্দন দীননাথকে নিয়ে পার হয়ে গেলো রাস্তা ; কিন্তু দীননাথের হাত থেকে লাঠিটা হঠাৎ পড়ে গেলো রাস্তায়। জনার্দন দীননাথকে ফুট পাথে দাঁড় করিয়ে লাঠিটা আনতে গেলো। সে একবারে অন্যমনস্ক—দেখেনি মোটর আস্‌ছে। লাঠিটা তুলতে যেতেই মোটরের সঙ্গে লাগ্‌লো তার ধাক্কা। হৈ হৈ করে লোক ছুটে এলো। মোটর চালক নাম্‌লো। দীননাথ কাতরভাবে ডাক্‌লে, জনার্দন, জনার্দন, কোথা তুমি ?

তখন গোলমাল সুরু হয়েছে। দীননাথ মাঝে মাঝে শুন্‌তে পেলে কতকগুলো কথা, ইঃ হাড় গুঁড়িয়ে গেছে, বাঁচবে না বোধ হয়।

দীননাথ পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলো আবার, জনার্দন ! কিন্তু···

সেই ডাক আবার দিয়েও দীননাথ হাসপাতালের একখানা ঘরে বসে মুমূর্ষু জনার্দনের কাছ থেকে কোনো সাড়া পেল না।

জনার্দন একটু রাত্রে মারা গেলো। দীননাথ জনার্দনকে জাপ্‌টে ধরলে ; তার চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রু পড়তে লাগলো। সে এর জন্যে দায়ী করলে সুরেশকে। সুরেশের জন্যেই জনার্দন প্রাণ দিলে। সুরেশ খুনী, সুরেশ তার শত্রু। দীননাথ মৃতের পাশে বসে প্রতিজ্ঞা করলে, বাণীর বিয়ে সে দেবে ভালো ঘরে। বাণী, বাণী ! বৃদ্ধের মন কিছুতেই মান্‌তে চাইলে না, বাণীকে সে কি বলবে ! সে যে নিরপরাধ—সে যে শুধু নির্মল ফুল······!

—ছয়—

দীননাথ ও জনার্দন উৎসবের মাঝে এসে পড়ায়, উৎসবের কোলাহলটা থেমে গিয়েছিলো ; তারা চলে যেতেই রেখা-স্থরেশের বাসর ঘর ভরে গেলো যুবক-যুবতীতে। অস্বাভাবিক পোষাকের যুবকের দল, কতকগুলি স্থরেশের বন্ধু। পোষাকগুলো দেখলে মনে হয় এরা বোধ হয় নির্বোধ আর মেয়েদের দেখলে মনে হয় তারা বোধ হয় নির্লজ্জা ! যাই হোক্ বাসর ঘরের মধ্যে তাণ্ডব-লীলা হয়ে চললো। সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে রেখা অর্গানের সামনে বসে একখানা গান গাইলে ! স্থরেশ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে আকাশের পানে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিলো। গানের মাঝখানে দু'জন মেয়ে তাকে টেনে আনলে ঘরের মাঝখানে, তারপর তাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে নাচতে আরম্ভ করে দিলে।

নাচগান সমাপ্ত হবার পর একচোট হাসি ও হাততালি ; তারপর রাত বেড়ে যাবার জন্যেই হোক আর যে জন্যেই হোক রেখা-স্থরেশকে বাসরঘরে একলা রেখে ঘর খালি হয়ে গেলো।

রেখা বিছানার ওপর আড়ভাবে শুয়ে পড়লো তারপর কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে হাতে মাথা রেখে ঈষৎ ব্যঙ্গ সহকারে বললে, সন্ধ্যেবেলায় যে দুটো লোক এসেছিলো, তারা কে ?

স্থরেশ সামান্য মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলে, একজন আমার বাবা, আর একজন তাঁর বন্ধু !

রেখা তেমনি তাচ্ছিল্যের স্থরে জিজ্ঞাসা করলে, কোনটা তোমার বাবা ?—

যিনি অন্ধ !

রেখা ফস করে বললে, ও, তোমার বাবা তাহ'লে কানা—

সুরেশ এবার পুরোপুরি সামনে ফিরল এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, আমার বাবার সম্বন্ধে তোমার সংযত হয়ে কথা বলা উচিত !

রেখা বিছানার ওপর উঠে বসলো ; তারপর দাঁড়িয়ে তরলকণ্ঠে বললে, ওরে, আবার তেজ দেখায় রে ! তুমি আমার সঙ্গে সংযত হয়ে কথা বলবে—বুঝলে ?

সুরেশ কোনো জবাব দিলে না। সে শুধু অন্যমনস্কভাবে ভাবতে লাগলো কত কথা, বিশেষত সন্ধ্যাবেলাকার সেই বিসদৃশ ঘটনা। কিন্তু সুরেশের এই মৌনতা রেখার আত্মসম্মানে বোধ হয় আঘাত দিলে। সে সোজা সুরেশের সামনে এসে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় বললে, ওরে—আবার চুপ করে থাকে রে !--বলে থামল না, আবার বলতে লাগলো, তোমার মতো পাড়াগেঁয়ে একটা উকিলকে আমি বিয়ে করতে রাজী হয়েছি কেনো জানো ? তুমি একদিন আমার মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলে, টাইগারকে আমার অমতে পোষ মানিয়েছিলে—সেই জ্বালায় আমি তোমায় বিয়ে করেছি—প্রতিশোধ নেবার জন্যে !

সুরেশ কথাগুলো শুনেও শুনল না। সে একখানা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো। রেখা চীৎকার করে বলে উঠলো, শুনতে পেয়েছো ?

সুরেশ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, যে কথা শোনা উচিত নয়, আমি তা শুনি না।

রেখা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, ওরে ! বটে—বলে সে হাণ্টারটা হাতে তুলে নিয়ে রাগেরচোটে একখানা চেয়ারের ওপর

সেটা দিয়ে সপাৎ করে একটা আঘাত করলে। সুরেশ তফাতে গিয়ে মুচকি হাস্‌তে লাগলো।

রেখা আবার রুখে উঠল, তুমি হাসছো?

—কেন হাসবার সময়ও তোমার অনুমতি নিতে হবে নাকি?

রেখা বললে, হ্যাঁ। বলে বিছানার উপর শুয়ে পড়লো। একটু পরে ঘুমিয়েও পড়লো।

সুরেশ আজও রেখাকে অসভ্য বলে ঘৃণা করলে কিন্তু মাঝে মাঝে সে ভেবেছিলো যে রেখা এখনও ছেলেমানুষ! দূরে রেখে দিলো সে রেখার চিন্তা—তার মনে হলো তার বাবার কথা, জনার্দনের কথা, বাণীর কথা! সবচেয়ে বেশী সে অপরাধী ভাবলে নিজেকে বাণীর কাছে। বাণী—ছোট্ট, সরলা মেয়ে। কিন্তু কার দোষে তার জীবনে এমন একটা প্রবঞ্চনা এলো? সুরেশ ভাবলে, সে কি তার দোষ! কিন্তু···কাকে সে বোঝাবে যে বাবার সম্মান রাখতে সে নিজের সম্মানটুকু খুইয়েছে, তার বাবার প্রাণরক্ষার জন্যে সে তার শেষ স্বাধীনতাটুকুও বিসর্জন দিয়েছে। ভাবলে সে, তার বাবা সেদিন কি ভুল ধারণাই না নিয়ে গেলেন! জনার্দনের কথা মনে পড়তে তার সামনে ভেসে উঠলো নিষ্পাপ সুন্দর সৌম্য মূর্তি—সে মূর্তি জনার্দনের। সে ও-ভাবনাকে চাপা দিলে। বাণীর বিয়ে তার সঙ্গে না হলেও হবে অন্য কারও সঙ্গে কিন্তু···। তার দৃষ্টি পড়লো ঘুমন্ত রেখার দিকে। সে ঝট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে। সে কিছুতেই অসভ্য ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করতে পারলে না।

ভোরের আলো উঁকি দিতে লাগলো। তখনো সুরেশ চিন্তায় ঘুমোয়নি। সে আস্তে আস্তে দরজা খুলে সকলের

অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেলো। পিছনে রইলো পড়ে, তার নব-বিবাহিতা স্ত্রী।

কখন কি দরকার হয় ভেবে মনি ব্যাগটি তার সঙ্গে নিল, সে সোজা স্টেশনে এসেই দেশে যাবার একটা ট্রেন পেয়ে গেল। এবং তারই একটা কামরার এক কোণে সে চেপে বসল।

বিকেলবেলা বাড়ী পৌঁছে সে রাজলক্ষ্মীর কাছে শুনলে দীননাথ বা জনার্দন কেউই তখনো ফেরেনি। তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো। সে এখানকার সব ব্যাপার শুনে আরও দমে গেলো। তারপর সে এক এক করে তার সমস্ত কথা মাকে জানালে। সে জানিয়ে দিলে কেন তাকে এইভাবে বিয়ে করতে হয়েছে—কেনো তার বাবার কথা অমান্য করতে হয়েছে। রাজলক্ষ্মী সমস্ত বুঝলেন এবং নিঃশঙ্ক-চিত্তে স্থির করলেন সুরেশ নির্দোষ।

সে-রাত্রে সুরেশ সেখানে থেকে গেলো। কিন্তু পরদিন সকাল-বেলা পর্যন্ত যখন দীননাথ এলেন না তখন সে বিব্রত হয়ে মাকে জানালে, আমি তাহলে এখুনি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি মা, খুঁজে দেখি ;—যদি এর মধ্যে ফিরে আসেন, আমায় টেলিগ্রাম করো।

রাজলক্ষ্মী সজলচক্ষে জানালেন, আচ্ছা!

সুরেশ যাবার সময় আবার বললে, মা, মনে শান্তি পাচ্ছি না। আমার ওপরে রেগে দুদিন হলো বাবা চলে গেছেন, এখনো বাড়ী ফিরলেন না···। তুমি যেনো আমার উপর রাগ করো না মা, আমি তোমায় সবই বলেছি—

সুরেশ রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। রাজলক্ষ্মী বললেন, আমি সব বুঝেছি বাবা, তুমি যা করেছ সব আমাদেরই জন্যে···। তারপর একটু পরে সুরেশের দিকে চেয়ে অত্যন্ত

কোমলভাবে বল্লেন, সুরেশ কিন্তু একটা কথা ভুলিস্নে। যাকে বিয়ে করেছিস—সে যাই হোক্, সে এ-বাড়ীর কুললক্ষ্মী। তাকে সংশোধন করিস কিন্তু তার আগে তাকে আপন করে নিস্। তাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছেরে…

সুরেশ মাকে আর একবার প্রণাম করে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, সেই সময় দীননাথের গলা পাওয়া গেলো, পশু, পশু…

দীননাথ বাড়ীতে ঢুকলো যেন একটা ভাঙা চোরা জাহাজ। সমস্ত অবয়বের ওপর স্পষ্টভাবে ফুটে রয়েছে একটা অত্যন্ত করুণ ইতিহাস। পশুপতি দীননাথের কাছাকাছি গিয়ে বল্লে, কর্তা—

দীননাথ তাকে ছুঁতে বারণ করে তীব্রভাবে বল্লে, ছুঁসনে—ছুঁস্নে—তোর মাকে ডাক্, গঙ্গাজল নিয়ে আসুক—আমি মড়া পুড়িয়ে এসেছি—

রাজলক্ষ্মী ভীতকণ্ঠে বল্লেন, কি বল্ছো গো! কি হয়েছে?

দীননাথ স্থিরভাবে বল্লে, হবে আবার কি! জনার্দনকে কোলকাতায় পুড়িয়ে এলাম। তোমার ছেলে সুরেশ তাকে হত্যা করেছে—

রাজলক্ষ্মী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললেন, ওকি বলছো তুমি?

ঠিকই বল্ছি! জনার্দন কলকাতায় গিয়ে দেখ্লো সুরেশ বিয়ে করেছে। তার কত বছরের আশা একনিমেষে চুরমার হয়ে গেলো। সে কাঁদলে না; কিছু বলবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারলে না—চুপ করে গেলো, একেবারে পাথর হয়ে গেল!

এমন সময় বাণী এসে দীননাথের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো, বল্লে, জ্যাঠামশায়—ওরা সব কি বলছে,—বাবা?

দীননাথ তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, আয় মা, আয়…

বাবা কোথায় জ্যেঠামশাই ?

দীননাথ কাঁদতে কাঁদতে বল্‌তে লাগলো, তোর বাবা নেই মা, তোর বাবা নেই। চুপ কর্‌, কাঁদিসনে—সংসার বড় অকৃতজ্ঞ মা, তাই জনার্দন সংসার ছেড়ে চলে গেল—সে তোকে যে আমার হাতে দিয়ে গেছে! আজ থেকে তুই আমার একমাত্র সন্তান—তোর সমস্ত ভার আমার। বাণী...

বাণী ঢলে পড়লো। রাজলক্ষ্মী ছুটে এসে তাকে কোলে করে নিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন বাণীর কত দুঃখ! অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তিনি বাণীর মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন।

দীননাথ বাণীর কান্না শুনে আবার বল্‌লেন, ওরে শোন্‌, তোর মা যখন মরে যায়, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোকে আমার বাড়ীতে নেবো—তোর বাবার মৃত্যুশয্যায় আমি আবার শপথ করেছি, তোর ভালো ঘরে বিয়ে দেবো, তুই আমার সে শপথ মিথ্যা করে দিস্‌নে যেন—আয় বাণী, আমার কোলে আয়। আমি কাল থেকে আবার যাত্রার দলে যাবো, প্রতি রাত্রে যাত্রা করবো—প্রতিদিন রোজগার করবো তোর জন্যে—বাণী তোর জন্যে—শুধু তোর জন্যে...

অন্ধের নয়ন দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়তে লাগলো। পড়ন্ত দীননাথকে পশু ধরে ঘরে নিয়ে গেল। সুরেশ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে খানিকক্ষণ। সে যে কি করবে ভেবে পেল না। অথচ সে জানে তার কোন দোষ নেই! সে কেবল অসহায় ভাবে একবার রাজলক্ষ্মীর মুখের পানে চেয়ে দেখলে।

বাণীর কান্না তাকে মর্মাহত করে দিলে কিন্তু বাণীর এই আকস্মিক বিপদের জন্যে—সুরেশ বল্‌তে চাইলে—সে দায়ী নয়!

*

অভিশপ্ত দিনটা রাত্রে মিলিয়ে গেলো! সুরেশ দেখলে সেই রাত্রি থেকেই দীননাথ যাত্রার দলে যাওয়া সুরু করলে।

সুরেশ রাজলক্ষ্মীকে সে-কথা বল্‌তে, তিনি শুধু বল্‌লেন, এখন আর বাধা দেওয়া যাবে না সুরেশ—

সুরেশ আমতা-আমতা করে বল্‌লে, এমনি করলে বাবার শরীর ভেঙ্গে পড়বে মা, তুমি বারণ করো কাল থেকে।—

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর আবেদন দীননাথ অগ্রাহ্য করে পরের দিনও যাত্রার দলে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো, গিন্নি মনে রেখো, পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করলে নরকে পচতে হয়। আমার বাণী—আমার বাণীর জন্যে আমি নিজেকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌তে পারি; গিন্নি তুমি আমায় বাধা দিয়ো না, আমায় কোনোদিন বাধা দিয়ো না।

সুরেশ পাশ থেকে দাঁড়িয়ে শুন্‌লে সে-কথা। সে খানিক ভেবে নিলে, তারপর যাত্রাদলের অধিকারী রসিকলালের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বেরিয়ে পড়লো।

*

তখন যাত্রার সাজ-ঘরে এক মজার অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। প্রাণকেষ্টো মিনতিপূর্ণ স্বরে বল্‌ছে, আমায় মিথ্যে সং সাজানো কেন? নাও হে অন্ধমুনির জটা; যখনি দীননাথ আসবে, অমনি অধিকারী গদগদ হয়ে যাবে, বল্‌বে—প্রাণকেষ্টো, আজ তবে দীননাথই অন্ধমুনি সাজুক। সাজুক, রোজ সাজুক না—আমায় সাজিয়ে, সাজ খুলে নেওয়া,—একি ধর্মে সইবে? আমার…

সেই সময় রসিকলাল এসে ব্যস্তভাবে বল্‌লে, প্রাণকেষ্টো, শিগগির দাড়ি খুলে ফেল—শিগগির ; তোমায় যমদূতের পার্ট করতে হবে ; তিনকড়ি আসেনি আজ। নাও, নাও—তাড়াতাড়ি…

প্রাণকেষ্টো বিরক্তভাবে বল্‌লে, কিন্তু তিনকড়ি যদি আবার এসে পড়ে, তাহলে যমদূত ছেড়ে আমায় আবার কি সাজ পরতে হবে ?

প্রাণকেষ্টোর অসহায় মুখটি তখন দেখবার মতো। রসিকলাল হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, তখন সাজবে ভগ্নদূত, ভগ্নদূত—

প্রাণকেষ্টো মুখটা কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। একজন ছোট ছেলে এসে রসিকলালকে জানালে, অধিকারী মশাই, একজন বাবু আপনাকে ডাক্‌ছে—বল্‌লে দীননাথ বাবুর বাড়ী থেকে আস্‌ছে—

রসিকলাল সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলে কে একজন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রসিক-লাল চলে যাবার একটু পরেই দীননাথ সাজ-ঘরে প্রবেশ করল।

আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করে রসিকলাল জিজ্ঞাসা করলে আপনি…

আগন্তুক জবাব দিলে, আপনি আমায় চেনেন না, আমি দাননাথ বাবুর ছেলে, সুরেশ !

রসিকলাল হাঁ করে চেয়ে রইলো সুরেশের দিকে। ব্যাপারটা ঠাওর করতে পারলে না। সুরেশ আরম্ভ করলে, দেখুন আমার বাবার শরীর অত্যন্ত খারাপ। রোজ যদি রাত জেগে যাত্রা করেন, বাঁচবেন না তাহলে। আপনি যদি কোন রকমে ওঁর যাত্রা করা বন্ধ করতে পারেন…

রসিকলাল প্রায় লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, আরে মশাই, বন্ধ করতে বল্‌বো কি ? আগে কত হাতে-পায়ে ধরে ওঁকে রাজী করতে হতো। ওঁকে যদি বারণ করি, আমার কত লোকসান হবে জানেন ?

সুরেশ জানতে চাইলে, কত বলুন ?

রসিকলাল বল্‌লে, কত ! নবলগ টাকা, মাসে দু'তিন শো—

সুরেশ মরিয়া হয়ে বল্‌লে, আপনাকে আমি মাসে চারশো করে টাকা দেবো—

রসিকলালের চক্ষু কপালে উঠলো—বল্‌লে, ওরে বাবা ! তারপর উত্তেজনা সামলে নিয়ে বল্‌লে, বেশ দেখি চেষ্টা করে—যে রকম লোক ! কিন্তু ওঁকে তো মশাই কিছু দিতে হবে—অন্তত একশো টাকা—

সুরেশ কোটের পকেট থেকে দুশো টাকা বের করে বল্‌লে, আপনি এখুনি এই দুশো টাকা নিন। ওঁকে একশো টাকা দিন, আপনি একশো টাকা নিন্‌ ;—আমি কালই মণি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেবো—আপনি বিশ্বাস্‌ করুন…

রসিকলালের তখন জিভ দিয়ে জল ঝরে আর কি ! সে আগ্রহের সঙ্গে বল্‌লে, বিশ্বাস ছাড়া কি পথ আছে মশাই ? কথায় বলে বিশ্বাসেই বহুদূর—দেখি কি হয়—

—কিন্তু দেখুন, একটা কথা ;—আপনি জানাবেন না ওঁকে যে আমিই টাকা দিচ্ছি।

রসিকলাল জিভ কেটে বল্‌লে, না, না কি যে বলেন !

সুরেশ রসিকলালের সঙ্গে সাজঘরের দিকে চল্‌লো। রসিকলাল সুরেশকে দরজার গোড়ায় দাঁড় করিয়ে দীননাথের কাছে

গেল। দীননাথ তখন 'অন্ধমুনি' সেজে বসে আছে। রসিকলাল আস্তে আস্তে বল্লে, দীননাথ, তোমার এই শরীরে রাত জাগা সহ্য হবে না ভাই।

দীননাথ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। রসিক বলে কি, এতো দয়া মায়া তার শরীরে? বল্লে, হঠাৎ এ-কথা?

রসিকলাল বল্‌তে লাগ্‌লো, তোমায় যাত্রা করতে হবে না; মাসে একশো করে টাকা দেবো।

দীননাথ অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলে, যাত্রা করতে হবে না—মাসে একশো টাকা—তার মানে!

—এর আবার মানে বের করে ফেললে? তুমি সোজা কথা এত বাঁকা করে দেখো কেন বল তো দীননাথ? তোমার শরীর খারাপ, দিন কতক রেস্টো নাও; তারপর দু-তিন মাস বাদে এসে হৈ হৈ করে এ্যাক্টো করো। মাসে মাসে আমার কাছ থেকে একশো টাকা করে দাদন নাও…এই নাও একশো টাকা।

রসিকলাল পাঁচ টাকার কুড়িখানা নোট দীননাথের হাতে গুঁজে দিলে।

দীননাথ দাঁড়িয়ে উঠে বলতে লাগ্‌লো, রসিক অধিকারী, তুমি আমাকে ঘরে বসিয়ে মাসে মাসে একশো টাকা করে দাদন দেবে, না! ভেবেছো আমি এমনিই বোকা, তোমায় আমি চিনি না! কে তোমায় টাকা দিয়েছে জানো? বাপকে যে জগতের কাছে মিথ্যাবাদী করে, যে বড়লোক শ্বশুরের টাকায় বাপের ঋণ-পরিশোধ করে, তার টাকা আমার কাছে গো-রক্ত! রসিকলাল জান তুমি, জনার্দনের আত্মা এখনও আমার আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়;—কে তাকে মেরেছে জানো? তার টাকা…

বলে দীননাথ টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলে। নোটের কাগজগুলো দণ্ডায়মান সুরেশের চারিধারে ঝরে পড়লো। সুরেশের চোখ দিয়ে জল ঠেলে বার হয়ে এলো। তার মনে হলো তার বাবা তাকে চিরদিনের জন্যে দূরে সরিয়ে দিলেন। সুরেশ টাকাগুলো নিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালে। কিন্তু কে যেনো তাকে আটকে রাখতে লাগলো। সে সেখান থেকে সরে গিয়ে আসরের মধ্যে দাঁড়ালো। কেন কে জানে!

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো অভিনয়। রাজা দশরথ মৃগয়ায় বেরিয়ে ভুল করে সিন্ধুকে তীর মারলেন। সিন্ধু মা, বাবা বলে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। সেই সময় সে দেখতে পেলে তার বাবা ছুটে আস্‌ছেন বল্‌লে বল্‌তে, কে, কে চীৎকার করে, কার ক্রন্দন? কে ডাকে?—ওরে পুত্র ক্রোধভরে যদি কোনো কথা বলে থাকি, সে কি সত্য? যদি অভিমান করে কোনদিন বলে থাকি, আমি তোকে ভালবাসিনা, সে কি সত্য? না, না,—সে মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। আজ আমার মন অজানা ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তুই ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়···

সুরেশ দেখলে তার বাবার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরছে। এ কি তার বাবার প্রাণের কথা না শুধু অভিনয়? সে একবার ডাকতে চেষ্টা করলে, বাবা! কিন্তু তারপর কি মনে করে ডাকলে না; শুধু নতমস্তকে, পিতার চরণে প্রণাম জানিয়ে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে যাত্রার ভীড় থেকে।—

তার পরদিন সে কলকাতার পথের পথিক হলো···

—সাত—

কলকাতার আকাশে তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। সুরেশ রায়বাহাদুরের বাড়ীতে প্রবেশ করলে। সিঁড়ির ওপর দেখতে পেলে রেখার দাসী লছমী দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই লছমী ওপরে রেখার ঘরে চলে গেল।

রেখা তখন রেডিয়ো নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলো। একবার এ-ষ্টেশন ধরে, একবার ও-ষ্টেশন ধরে! অর্থাৎ সে-এক মিশ্র উদ্ভট চীৎকার! লছমী এসে ভয়ে ভয়ে বল্‌লে, ছোট মেম সাহেব—জামাইসাব—

রেডিয়োর চীৎকারে রেখা শুনতে পাবে কি না পাবে—এই ভেবে লছমী আবার বল্‌লে, জামাইসাব—

রেখা রেডিয়ো বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলে, কৌন?

—জামাইসাব—

রেখা দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীরভাবে বল্‌লে, নিকাল দেও।

লছমী যেতে যেতে বল্‌লে, আচ্ছা।

রেখা লছমীকে পিছনে ডেকে আবার বল্‌লে, শুন্ পহলে—পুছ উস্‌সে, চারদিন ও কাঁহা থে?

লছমী তাড়াতাড়ি বল্‌লে, চারদিন নেহি মেমসাহেব;—সাড়ে পাঁচদিন হো গিয়া!

রেখা প্রভুত্বের সুরে বললে, শনি—রবিবার ম্যয় দেড়দিন ছুটি দে সকতী—বাকী চার দিন?…

লছমী যোগ করলে, আপনা ঘর গ্যায় শায়দ—

রেখা চেঁচিয়ে বলে উঠল, তব্ উস্‌সে কহ দে—আপনা ঘরমেই রহনা—ইঁহা নেহি আনা—!

লছমী চলে যেতে রেখা আবার রেডিয়ো নিয়ে কসরৎ সুরু করলে।

সুরেশ এসেই রায়বাহাদুরের ঘরে ঢুক্‌লো। রায়বাহাদুর তখন কোনো কাজ করছিলেন—

সে গিয়েই সোজা বল্‌লে, আপনি অনুমতি দেন, আমি এখান হতে চলে যেতে চাই;—আমি কিছুদিন কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে চাই।

রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন কেন ?

সুরেশ বল্‌লে, সব কথা আপনাকে আমি কি করে বোঝাব ? আমি পয়সার লোভে বিবাহ করিনি—আমি আপনার কাছে টাকা নিয়েছিলাম আমার বাপকে সুখী করবার জন্য—তাঁর দেনা পরিশোধ করবার জন্য। তাঁর **heart** খারাপ—যাতে তিনি পয়সার অভাবে মনে অশান্তি না পান, যাতে ভগ্ন শরীরে কোনো কষ্ট তাঁকে না করতে হয় তাই—বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার এ পয়সা স্পর্শ করবেন না।

রায়বাহাদুর আবার প্রশ্ন করলেন, কেন ?

সুরেশ বল্‌লে, তাঁর এক গরীব বন্ধুর মেয়েকে পুত্রবধূ করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। আমি তাঁর সে সত্য পালনে বাধা দিয়েছি—যদিও বা কোনদিন ক্ষমা করতেন কিন্তু তাঁর সেই বন্ধু আমার এ-বাড়ীতে বিবাহ দেখে ফিরে যাবার সময় হঠাৎ **accident**-এ মারা যান। বাবার ধারণা—তিনি এই মনোকষ্টেই আত্মহত্যা করেছেন—

রায়বাহাদুর কলমটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বল্‌লেন, কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু সুরেশ, আমি তো তোমায় যেতে দিতে পারি না ;—তুমি জানো আমার মেয়েকে বিবাহ করার পূর্বে, তুমি কি কথা দিয়েছো ?

সুরেশ মাথা নীচু করে বললে, আমি জানি। আমি শপথ করেছি আপনার ঘরজামাই হয়ে থাক্‌বো, কোনোও দিন আমি আমার স্ত্রীর বা আপনার মতের বিরুদ্ধে যাবো না—আমি জানি—আমি আমার সমস্ত মনুষ্যত্ব বিক্রী করেছি। কিন্তু···

রায়বাহাদুর বললেন, 'কিন্তু' কি, বল ?

সুরেশ তখন কত কি ভাবছিলো। কর্তব্য কি, সেই চিন্তাই ছিল তার কাছে মুখ্য। সে অন্যমনস্কতা কাটিয়ে সরলভাবে বললে, কিছু না। আমি এখানেই থাকবো। আমি আমার শপথ পালন করবো ; কিন্তু আপনার এই টাকা থেকে আমি কিছু একজনকে দিয়ে ফেলেছি ; আমি উপার্জন করে পরিশোধ করবো। বাকিটা এই নিন—আমিও আর এ-টাকা স্পর্শ করতে পারি না। এই আপনার সমস্ত বাকি টাকা···বলে সে ব্যাগ শুদ্ধ টাকা রায়-বাহাদুরের সামনে টেবিলের ওপর রেখে দিলে।

রায়বাহাদুর হঠাৎ তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, সুরেশ, আমি যদি তোমাকে তোমার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিই, তাহলে তুমি বোধ হয় তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ ক'রে আজই চলে যাবে—

সুরেশ ধীরভাবে জবাব দিলে, কেন যাবো ! যেদিন বুঝবো আমি স্বাধীন, আমি আমার স্ত্রীর ক্রীতদাস নই, সেদিন থেকে আমি চেষ্টা করবো তাকে মানুষ করতে ;—তখন তাকে সংশোধন করাই হবে আমার ধর্ম। তাকে পরিত্যাগ করবার জন্য আমি

বিবাহ করি নি ! বলে সুরেশ পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এলো। লছমী ওপর থেকে দেখলে সুরেশ ওপরের সিঁড়িতে পা দিয়েছে। সে আবার রেখার কাছে হাঁফাতে হাঁফাতে গেলো। গিয়ে বললে, মেম সাহেব জামাইসাব—

রেখা সহজভাবে বললে, নিকাল গিয়া ?

—নেহি, উয়ো উপর আ রহে হ্যাঁয় !

রেখা চেঁচিয়ে উঠলো, উপর, কাঁহা ?

লছমী বাইরের দিকে চাইতে চাইতে বললে, আপনা রুম মে···নেহি নেহি, এহি কামরা মে আ রহে হ্যাঁয়—

রেখা হুকুম দিলে, দরজা বন্ধ কর দো—

লছমী দরজা বন্ধ করতে গেলে সুরেশ সেটা ঠেলে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে। একটা আলনায় কোটটা খুলে রেখে, সে বসে পড়লো একখানা চেয়ারে।

রেখা তীক্ষ্ণস্বরে বললে, এখানে কেন, তোমার ঘরে যাও না ?

সুরেশ পাল্টা জবাব দিলে, আমার ঘরের দরজা বন্ধ দেখলাম—

রেখা শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বল্‌লে, তা কে আর সাড়ে পাঁচ দিন দরজা খুলে বসে থাক্‌বে ? নিয়ে যাও তোমার কোট—

সুরেশ শুধু বল্‌লে, যাচ্ছি। তারপর লছমীর দিকে চেয়ে বললে, লছমী, একগ্লাস পানি লাও—

লছমী সেই ঘর' থেকে জল আনবার জন্যে এগুতেই রেখা ধম্‌কে উঠলো, লছমী, পানি উনকা কামরামে লে যাও—ইহাঁ নেই।

লছমী জী মেমসাহেব বলে,সুরেশের দিকেএকবার চেয়ে চলে গেলো। রেখা আদেশ দিলে সুরেশকে, যাও তোমার ঘরে—

সুরেশ কোন কথা না বলে কোটটা তুলে নিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালে। নিরুত্তর থাকার জন্যে রেখা রেগে উঠলো, বললে, ওরে একেবারে good boy রে!—বলে সে সুরেশের সামনে এসে বললে, কোথায় ছিলে এতদিন – এই সাড়ে পাঁচদিন ?

—আমার বাড়ীতে।

—সে আবার কোন চুলোয় ?

সুরেশ রেগে উঠলো। কঠিন স্বরে বললে, সেই চুলোয়, যেখানে একদিন তোমারও পুড়ে মরা উচিত!

রেখা এই স্পর্দ্ধাজনক উত্তরে ফোঁস করে উঠলো, ওরে,—ওরে—ওরে, দাঁড়াও···তবে—এইভাবে আস্ফালন করে সে চীৎকার করে বললে সুরেশকে, যাও তুমি আমার বাড়ী থেকে চলে—

— একেবারে ?

—হ্যাঁ, একেবারে!

—কোনোদিন তোমার আমাকে দরকার হবে না ?

—কোনদিনই না, যাও—

সুরেশ ছোট্ট করে বললে, যাচ্ছি। রেখা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সুরেশ হাতের ওপর কোটটা ঝুলিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলো।

রেখা চারিদিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো এমন ভাবে যেনো সে ভূত দেখেছে—

ই-ই-ই-মাগো-যেওনা দাঁড়াও ই-ই-ই···বলে রেখা সুরেশকে জাপ্টে ধরলে। লছমী চীৎকার শুনে সেখানে এলে সুরেশ তাকে জিজ্ঞাসা করলে, লছমী, ইনকা কৈ বীমার হ্যায় ?

লছমী বললে, বীমার নেহি—আরসুলা। লছমী ঝাঁটা দিয়ে ঘরের দেওয়ালের উপর দুটো আরসোলাকে মেরে ফেল্‌লে। রেখা তেমনিভাবে সুরেশকে আঁকড়ে ধরে বল্‌তে লাগলো, লছমী, একদম মার দো। দিয়া ?

লছমী বললে, ফেক দিয়া মেম সা্‌ব···

রেখা আবার বল্‌লে, ফেক দিয়া ?

—একদম মারকে ফেক্‌ দিয়া—

এইবার রেখা শান্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সুরেশকে ছেড়ে দিলে। একমুহূর্ত পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে সুরেশকে, তুমি এখনও এখানে ?

সুরেশ কোনো কথা বল্‌লে না। ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হলো।

রেখা আজ একটু বিস্মিত হলো। যত অত্যাচার করা যায় লোকটীর ওপর, সে ততই মুখ বুঁজে সহ্য করে। কোনো প্রতিবাদ করে না। অথচ যখন সে উত্তর দেয়, সে উত্তরগুলো তাকে ছুঁচ ফোটায়। সুরেশ বেরিয়ে যাবার পর, রেখা ঘরের চারিধারে পায়চারী করতে লাগ্‌লো। হঠাৎ তার চোখ পড়লো দেয়ালে টাঙানো দু'খানা ছবির দিকে। দুখানা ছবিই প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন নিয়ে অাঁকা। একখানায় রয়েছে আলিঙ্গনাবদ্ধ দম্পতি আর একখানাতে রয়েছে এক সাথে রাধা-কৃষ্ণের মিলন। প্রথমখানি বিলিতি। রেখা ছবি দু'খানার দিকে চেয়ে মধুর ভাবে হাসলে। সুরেশ এ হাসি দেখলে হয়তো পূর্বের রেখাকে ভুলে যেতো। রেখা যেনো কোনো অগনি আলিঙ্গন অনুভব করলে, সে যেনো তার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়েছে !···

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার সে-নেশা গেলো ছুটে। তার

মনে রইলো না সে-ছবি দু'খানার কথা। সে রেডিয়ো খুলে দিয়ে গান শুনতে লাগলো।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে সুরেশ এলোমেলো ভাবে ঘুরতে লাগলো। মাঝে মাঝে সে ভাবছিলো সে সত্যিই রেখাকে ছেড়ে চলে যাবে, না আবার তার কাছে ফিরে যাবে? রেখা কি সত্যই তাকে ভালোবাসে না? না, এটা তার ওপরের একটা মুখোসমাত্র! হয়তো রেখা মনে মনে তাকে ভালবাসে। কেবল ছেলেমানুষী করে তাকে এমনি জ্বালাতন করে। কিন্তু এ-ভেবে সুরেশ সান্ত্বনা পেলে না। রেখা ছেলেমানুষ নয়, সে শিশু নয় —তার বিবেচনা করবার বয়স হয়েছে! তবে—তবে? সুরেশ একটা গ্যাসপোস্টের তলায় এসে দাঁড়ালো। পাশে একটা গলি। ভাবলে, না আর রেখার কাছে গিয়ে দরকার নেই…বেরিয়ে পড়া যাক্ বিশাল বিশ্ববক্ষে, বিচরণ করা যাক্, কোথাও না কোথাও তার হাঁটা শেষ হবে। কিন্তু হঠাৎ তার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। আসবার সময় মা তাকে বলেছিলেন…সুরেশ, একটা কথা ভুলিস্ নে! যাকে বিয়ে করেছিস, সে যাইহোক্… সে এ-বাড়ীর কুললক্ষ্মী, তাকে সংশোধন করিস কিন্তু তার আগে তাকে আপন করে নিস্।

সুরেশ মায়ের আজ্ঞাই শিরোধার্য করে নিলে। সে আবার রেখার বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে। হাজার হোক্ রেখা তার স্ত্রী, শত দোষ তার থাক্লেও সে তার ধর্মপত্নী। সুরেশ আবার এসে ঢুক্লো রায়বাহাদুরের বাড়ী। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে দেখলে রায়বাহাদুরের অফিস ঘরে তখনও আলো জ্বল্ছে। তখন প্রায় রাত দশটা। সুরেশ অবাক হয়ে গেলো…সে রাস্তায়

রাস্তায় ঘুরেছে প্রায় দুটি পুরো ঘণ্টা। সে অফিসঘরের ধারে গিয়ে কথাবার্তা শুনতে পেলে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে ওপরে উঠে গেলো।

রায়বাহাদুর ঘরে হরিমোহনের সঙ্গে কথা কইছিলেন। রায়-বাহাদুর বল্‌লেন—তান্ত্রিকাচার্য কোথায় ?

—এজ্ঞে Call-এ গেছেন।

—এতো রাত্রে Call-এ গেছেন! চুলোয় যাক—। কাল তুমি আমাকে একবার সুরেশদের দেশে নিয়ে যেতে পারবে ?

হরিমোহন ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, এজ্ঞে খুব পার্বো।

রায়বাহাদুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কটায় ট্রেণ ?

—এজ্ঞে, সকাল সাতটা দু'মিনিটে—

—বেশ তুমি সকালেই এসো, আমি তৈরী থাক্‌বো ছটার সময়, কেমন ?

—যে এজ্ঞে। বলে হরিমোহন চলে গেলো। সুরেশ সিঁড়ির মাথায় উঠে দেখলে হরিমোহনকে যেতে। সে এ-বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে সোজা রেখার শোবার ঘরে গিয়ে হাজির হলো। ঢুকে চোখে পড়লো লছমী দাঁড়িয়ে আছে। সে লছমীকে বল্‌লে, লছমী, বাহার যাও।

রেখা ফোঁস করে উঠে বল্‌লে, লছমী, তুম ইঁহা রহো।

সুরেশ তীক্ষ্নস্বরে আবার বল্‌লে, নেহি লছমী বাহার যাও।

লছমী রেখার দিকে একবার, সুরেশের দিকে একবার চাইতে চাইতে বাহিরে চলে গেলো।

রেখা প্রশ্ন করলে, ফিরে আসতে লজ্জা হলো না ?

সুরেশ নিরুত্তর!

—ওরে ! উত্তর দাও, তুমি কেন আবার আমায় জ্বালাতে এলে !

সুরেশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, নিজে জ্বল্‌বো বলে।

রেখা আঙ্গুল নেড়ে তাকে সাবধান করে দিলে, এসব চল্‌বে না। তুমি বাইরে যাও, এখানে তুমি শুতে পাবে না।

সুরেশ একখানা ইজিচেয়ারে বসে পড়ে বল্‌লে, আমি শোব না, বসে থাকবো !

—ওরে ! তুমি প্রহরী না কি ?

সুরেশ জবাব দিলে, হ্যাঁ, তোমার কখন মাথা খারাপ হয়ে যায়, তার একটা হিসেব রাখবার জন্যেও আমাকে পাহারা দিতে হবে।

রেখা ফুলে উঠ্‌লো রাগে, বল্‌লে, আমাকে পাগল বল্‌লে কেন ? বলো কেন, কৈফিয়ৎ দাও। সুরেশ কোনো উত্তর দিলে না। রেখা রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুঁজলে। কিন্তু একটু পরে চোখ পিট পিট করতে করতে উঠে পড়ে সুরেশের কাছে গিয়ে বল্‌লে, এ ইজি চেয়ারখানা আমার, তুমি উঠে যাও !

সুরেশ চুপচাপ সে-চেয়ার ছেড়ে অন্য একখানা চেয়ারে বস্‌লো।

রেখা আবার শুয়ে পড়লো। একটু পরে ঘুমিয়েও পড়লো। সুরেশ দেখলে জ্যোৎস্নার কণাগুলো রেখার ঘুমন্ত মুখখানির উপর খেলা করছে। রেখার একখানা হাত নিজের গালের ওপর, আর একখানি বুকের ওপর ! সুরেশ দেখে মোহিত হয়ে গেলো। এ যেনো অন্য রেখা ! ঘুমন্ত অবস্থায় রেখাকে এতো সুন্দর দেখায় ? সুরেশ ভাবতে লাগলো। সে বুঝলে, সে রেখাকে

ভালবাসে। নানা বিঘ্ন ও দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে তার জীবন বাঁধা হয়ে গেছে রেখার জীবনের সঙ্গে। তার ইচ্ছে হলো একবার, রেখার কপালে কি গালে···কিন্তু সে তা করলে না। চেয়ারের ওপর আড়াআড়ি ভাবে কাৎ হয়ে চোখ বুজলে।

ভোরবেলা প্রায় পৌনে পাঁচটার সময় সুরেশ বেড়াতে বেরিয়ে গেলো। সে নতুন করে সব কিছু বুঝতে চেষ্টা করলে।

প্রায় ছটার সময় হরিমোহন এসে ডাক্‌লে, রায়বাহাদুর ?

বেয়ারা জানালে আস্‌ছেন তিনি।

রায়বাহাদুর এসে বল্‌লেন, এসেছ ?

—এজ্ঞে !

তা হলে চল—

এজ্ঞে !

রায়বাহাদুর বেয়ারাকে বলে গেলেন, দিন দুয়েের জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি দরকারী কাজে, বুঝলি ?

—জী হুজুর !

রায়বাহাদুর ও হরিমোহন চলে গেলেন।

সুরেশ বেড়িয়ে ফিরল প্রায় সাড়ে ছটা। সে ঘরে ঢুকে দেখলে তখনো রেখা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ঘরের এক কোণে, স্প্রিং-এর সোফাটার ধারে একটা পর্দার আড়ালে সে বসে রইলো।

রেখা বেলা করে ঘুম থেকে উঠে গায়ের ওপর একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে নীচে নেমে গেলো। ডাক্‌লে, বাবা ?

বেয়ারা এসে জানালে, বড়া সাব বাহার গিয়া দো দিনকে লিয়ে—বহুৎ জরুরী কাম হ্যায় !

রেখা জিজ্ঞাসা করলে, একেবারে দো দিনকে লিয়ে ?—আচ্ছা, ঠিক হ্যায়—উয়ো কাঁহা হ্যাঁয়, উয়ো ?

বেয়ারা বল্‌লে, কোন্ মেমসাব ? টাইগর ?

লছমী পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো, বল্‌লে, বান্দার, টাইগর নেহি, জামাইসাব—

বেয়ারা এইবার বুঝে উত্তর দিলে, ও হ্যাঁ, জামাইসাবভি সুবা বাহার গিয়া, সায়েব আওর আপস্ নেহি আয়া—

রেখা উপরে উঠতে উঠতে বল্‌লে, আনেকো জরুরৎ ভি নেহি। যব গিয়া তো উস্‌কে জানে দো—দরওয়াজা বন্ধ কর দো—

বেয়ারা ভয়ে ভয়ে জানালে, জী মেমসাব !

রেখা পুনরায় নিজের ঘরে এসে কাপড়ের ওপরের সিল্কের গাউনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ; তারপর স্প্রিংএর সোফাটার উপর গড়িয়ে যেতে লাগলো। গড়াতে গড়াতে পর্দা ফাঁক হয়ে একেবারে প্রায় সুরেশের ঘাড়ে ! সুরেশকে দেখে রেখা অবাক্ হয়ে গেল, বল্‌লে, তুমি ! বেয়ারা বল্‌লে বেরিয়ে গেছ—

—গিয়েছিলাম সকালে বেড়াতে—অনেকক্ষণ ফিরে এসেছি।

রেখা পাল্টা প্রশ্ন করলে,—কেন ফিরে এসেছ ? আমি বাবাকে বল্‌তে গিয়েছিলাম, তোমার আর ফিরে এসে দরকার নেই।

সুরেশ জবাব দিলে, কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি, আমার ফিরে আসার দরকার আছে।

—ওরে ! কথা শিখেছে রে ! কি দরকার শুনি ?

সুরেশ গম্ভীরভাবে বল্‌লে, দরকার তোমাকে শাসন করা— !

রেখা রেগে উঠে বললে, কি, কি বললে ?

সুরেশ পুনরাবৃত্তি করলে তার কথাটা, তোমাকে শাসন করা—!

রেখা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, বটে! লছমী, বেয়ারা!

লছমী ও বেয়ারা ঘরে ঢুকতে রেখা বললে, আমার **hunter** কোথায়, কাঁহা হ্যায় hunter?

লছমী ও বেয়ারা খুঁজে কোথাও পেল না হাণ্টার। সুরেশ বললে, হাণ্টার আমি ফেলে দিয়েছি—

রেখা রাগে ফুলে উঠলো, ফেলে দিয়েছো? কোথা?

—রাস্তায়! ভেঙে কুচি কুচি করে—

রেখা চেঁচিয়ে উঠলো রাগে, বটে! বেয়ারা আউর একঠো হাণ্টার···

বেয়ারা ভীতস্বরে জবাব দিলে, আউর হাণ্টার নেই হ্যায় মেমসাব—

রেখা হুকুম করলে, হাণ্টার নেহি হ্যায় তো হামরা রাইফেল (**rifle**) লে আও। বলতে বলতে সে পাশের ঘরে ঢুকে গেলো। লছমী সুরেশকে উপদেশ দিলে, জামাইসাব একঠো আরশুলা লে আউ?

সুরেশ জানালে, নেহি তুম যাও।

লছমী চলে গেলো। একটু পরে পাশের ঘর থেকে দুমদাম শব্দ আসতে লাগলো। আর একটু পরে একটা **rifle** হাতে নিয়ে রেখা সুরেশের সামনে এসে দাঁড়ালো। সুরেশ খানিক অপেক্ষা করে বন্দুকটা রেখার হাত থেকে কেড়ে নিলে। রেখা চেঁচিয়ে উঠলো, বটে! এত বড় স্পর্ধা। ওরে! দরওয়ান—পুলিশ!

সুরেশ তাকে একখানা চেয়ারের ওপর বসিয়ে সেই সিল্কের গাউনটা দিয়ে তাকে বেঁধে ফেললে। রেখা ছটফট করতে থাকলে

সুরেশ বল্‌লে, শোন, কেন এ-কাজ করলাম জান? কাল রাতে তুমি ঘুমুচ্ছিলে—তোমার মুখের ওপর চাঁদের আলো পড়েছিল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম—তারপর মনে হল আমি তোমায় ভালোবাসি। বলে সে দূরে সরে গেলো। রেখা বাঁধা অবস্থায় ছট্‌ফট করতে লাগলো। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো! সুরেশ কোনো সহানুভূতি দেখালে না। সে দাঁড়িয়ে রইলো এমনি ভাবে, যেনো সে মজা উপভোগ করছে।

বাইরের বারান্দায় গোলমাল শোনা গেল। রেখার চীৎকার শুনে দরওয়ান, লছমী, বেয়ারা প্রভৃতি রেখার ঘরের দিকে এগুচ্ছিলো। সুরেশ বেরিয়ে এলো এবং ধমকের সুরে বল্‌লে, নীচে যাও। তোমাদের মেমসাব পাগল হো গিয়া—যাও···

ভৃত্যেরা একটুখানি দাঁড়িয়ে, ভয়ে ভয়ে নীচে চলে গেলো। সুরেশ ঘরে ফিরে এসে দেখলো, রেখা চেয়ার সুদ্ধু উল্টে পড়ে গেছে মাটিতে, সে তাড়াতাড়ি রেখার পাশে বসে বাঁধন খুলে দিলে। রেখা উঠে বসতে পারছিলো না; সুরেশ তাকে কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দিলে। কিন্তু একটু পরেই অবাক হয়ে গেলো, রেখার মূর্তি দেখে। সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে তীব্র সুরে বল্‌লে, বাবা এলে এর বিচার করবো।

সুরেশ উদাসীনভাবে বল্‌লে, পারবে এতদূর অভদ্র হতে? দোষটা তো তোমারই একলার, তা তো জানো!···তা তোমার যা অভিরুচি করতে পারো।

রেখা তার স্বাভাবিক দাম্ভিকতার সুরে জবাব দিলে, ওরে এত বড় সাহস রে। জানো, বাবা তোমায় জেলে দিতে পারে!

—তোমার তাতে খুব সুনাম হবে!

রেখা থেমে গেলো সুরেশের উত্তরে। সুরেশ সামান্য নিস্তব্ধতার পর বল্‌লে, আমি কিছুদিন বাইরে বেড়াতে যাবো।

রেখা সুরেশকে অবাক করে দিয়ে বল্‌লে, আমিও যাবো!

সুরেশ এরকম কথা শুনবে আশা করেনি। সে গম্ভীর ভাবে বল্‌লে, না তোমার যাওয়া হবে না!

—ওরে, আমার যাওয়াতে বাধা দেবে তুমি?

—যেতে হয় একলা যেয়ো—

রেখা ছেলেমানুষের মত বল্‌লে, যেতুমই তো তাই, বিয়ে হয়ে গেছে,—না হলে!

সুরেশ হাস্‌বে কি কাঁদ্‌বে বুঝতে পারলে না। সে জানালে, আচ্ছা যেয়ো আমার সঙ্গে!

রেখা আর কোনো কথা বল্‌লে না। সে চেয়ারের ওপর বসে পা দোলাতে লাগলো। সুরেশ বিস্মিতভাবে তার দিকে চেয়ে রইলো।

—আট—

গ্রামের বুকে সন্ধ্যা নেমে এলো। কুটিরে কুটিরে প্রদীপ জ্বলে উঠলো। পশুপতি দীননাথের ঘরে একটি লণ্ঠন রেখে গেলো। দীননাথ আজকাল কেমন যেনো মনমরা হয়ে থাকতো। সে বিশেষ কথা কইত না, কথা কইলেও, অনেক সময় তার সেই পূর্বের সরল লালিত্য খুঁজে পাওয়া যেতো না। তার কেবল মনে পড়তো সেই ভীষণ রাত্রির কথা যেদিন জনার্দন মারা যায়। সে নিজের মনেই শিউরে উঠে বলে, উঃ! জনার্দনের আত্মা তাকে সবসময় যেনো ঘিরে রেখেছে। দীননাথ হাতজোড় করে বলে—জনার্দন ভাই ক্ষমা করো, আমিই দোষী! তার দু' চোখ বেয়ে জল ঝরে। সে তো কতদিনের ইতিহাস—জনার্দনের সঙ্গে তার যখন্ প্রথম আলাপ হয়। বাড়ীর পাশে থাকৃতে থাকৃতে সে আলাপ হয়ে উঠে নিবিড়তর হয়ে। তারপর বাণীর মায়ের মৃত্যুর পর বাণীকে নেবার প্রতিশ্রুতি। বাণীর কথা মনে হলেই বৃদ্ধ ভেঙ্গে পড়ে, আর চোখদুটো জ্বলে ওঠে—ভাবে সব দোষ সুরেশের। সুরেশ তারই ছেলে! সে অবাক হয়ে-যায়। না, সুরেশ তার ছেলে নয়—সুরেশ তার কেউ নয়। দীননাথ কোনক্রমেই কোনোদিন সুরেশের নাম মুখে উচ্চারণ করতো না! একদিন রাজলক্ষ্মী বুঝি বলেছিলেন, সুরেশকে ডেকে পাঠাও—

দীননাথ ক্ষেপে উঠে বলেছিলো, তাহলে আমি এ-বাড়ী থেকে চিরদিনের জন্যে বেরিয়ে যাবো।

সেই থেকে রাজলক্ষ্মী দীননাথকে সুরেশের বিষয়ে আর

কোনো কথা বলতেন না। দীননাথ কেবল চেষ্টা করতে থাকতো সুরেশকে ভুলবার জন্যে! ছেলেকে ভুলবে পিতা! দীননাথ রাগের উত্তেজনায় স্নেহে গলে গিয়ে ডাকতো, বাণী, বাণী···মা।

বাণী দৌড়ে আসতো। এসে বৃদ্ধের কোলের পাশে বসে বলতো, এসেছি জ্যেঠামশাই!

—এসেছিস্ মা, কই? বলে বাণীকে হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিতো।

আজও বসে বসে সে ভাবছিলো বাণীর বিয়ে দিতেই হবে কোনো ভালো ঘরে—এ তার প্রতিজ্ঞা—শেষ প্রতিজ্ঞা। তাকে রাখতেই হবে। তার জন্যেই তো সে রোজ যাত্রার দলে যাচ্ছে! সে নিজের শরীরের মায়া করবে না—সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে টাকা জমাবার, যাতে বাণীর জীবন শান্তিময় হয়।

দীননাথ বসে বসে এইসব কথাই চিন্তা করছিলো। এমন সময় সে বাইরে থেকে ডাক শুনলে, মুখুজ্যেমশায়, দীননাথবাবু—

দীননাথ পশুপতিকে ডেকে বললে, দেখ্তো পশু, কে!

পশুপতি বেরিয়ে গেল এবং সামান্যক্ষণ পরে ঘরে ঢুকে বললে, কত্তা, দাদাবাবুর শ্বশুর এসেছে—কলকাতা থেকে—মস্ত বড়লোক—

দীননাথের কপাল কুঁচ্কে গেল, বললে কে? কে এসেছে?

পশুপতি আবার জানালে, দাদাবাবুর শ্বশুর—

দীননাথ দাঁড়িয়ে উঠ্লো। তার সারামুখে বিরক্তির ঢেউ খেলে গেলো—রায়বাহাদুরের আগমনে সে যে খুসী হয়নি, তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেলো। বললে, কেন? এখানে এসেছে কেন? না—

রাজলক্ষ্মী দরজার আড়াল থেকে দীননাথের কথা শুনে ঘরে ঢুকে বল্লেন, ওকি, কি বল্ছো তুমি! ভদ্রলোক এসেছেন তোমার বাড়ীতে; —আত্মীয় কুটুম্ব, অতিথি; তুমি আহ্বান করে নিয়ে এসো—

দীননাথ জ্বলে উঠলো, আত্মীয় কুটুম্ব! খুব হয়েছে! উনি যখন আত্মীয় কুটুম্ব হয়েছিলেন, আমায় আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন? আমি কাউকে আহ্বান জানাতে পারবো না—

পশুপতি বল্লে, কত্তাবাবু, বাবু ঘরে ঢুক্ছেন।

রাজলক্ষ্মী ঘোমটা টেনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন। রায়বাহাদুর ও হরিমোহন প্রবেশ করলেন। দীননাথ বল্লে, আসুন—অত্যন্ত অনাত্মীয় সম্বোধন তার কণ্ঠে বেজে উঠলো।

রায়বাহাদুর ও হরিমোহন উপবিষ্ট হলে দীননাথ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আমি অন্ধ, দরিদ্র। পশু! বাবুকে বসাও, মুখ হাত ধোবার জল এনে দাও···তামাক দাও···

রায়বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, থাক আমি বসেছি। তারপর দীননাথের দিকে চেয়ে বল্লেন, আপনি বসুন!

ভিতরের দরজার কড়া নড়ে উঠলো। পশুপতি 'যাই মা'! বলে ভিতরে চলে গেলো।

দীননাথ ও রায়বাহাদুর মুখোমুখি বসে। যেনো কারোরই কিছু বলবার নেই। দীননাথের বলবার কিছুই ছিল না, এ কথা সত্য। সে ভাবছিলো—এই সুরেশের শ্বশুর—যার মেয়ের সঙ্গে···। তার চিন্তায় বাধা পড়লো রায়বাহাদুরের কথায়ঃ

আপনার ছেলে আমার মেয়েকে বিবাহ করার জন্যে আপনি তার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন—

দীননাথ পাল্টা জবাব দিলে, আপনার একমাত্র ছেলে যদি আপনাকে না জানিয়ে এক রাজার মেয়েকে বিয়ে করতো, আপনি সন্তুষ্ট হতেন ?

রায়বাহাদুর ফ্যাসাদে পড়লেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ বললেন, যদি বুঝতাম যে, আমাকে সুখী করবার উদ্দেশ্য নিয়েই সে এ-কাজ করেছে, তাহলে হয়তো অসন্তুষ্ট হতাম না।

দীননাথ এ-কথার উত্তরে একটা খাপছাড়া গোছের জবাব দিলে, এমন লোকও জগতে থাকতে পারে, যারা পয়সার সুখটাকেই সবচেয়ে বড় মনে করে না।

রায়বাহাদুর আবহাওয়াটাকে শান্তিপূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে বললেন, কিন্তু দেখুন, বিয়ে যখন হয়েই গেছে, তখন আর ঝগড়াঝাঁটির দরকার কি ?

দীননাথ রেগে উঠে বললে, ও ! সুরেশ বুঝি তার হয়ে আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে ওকালতি করবার জন্যে ? ছিঃ —এতো কাপুরুষ সে !

রায়বাহাদুর তাড়াতাড়ি বললেন, না, সুরেশ আমায় পাঠায় নি। আমি নিজের ইচ্ছাতেই এসেছি। আপনি দেখছি আপনার ছেলেকে—

দীননাথ যোগ করে দিলে নির্মম ভাবে, ভালোবাসি না ; সত্যই তাই। সে আমার কাছে মৃত।

রায়বাহাদুর স্তম্ভিত। দরজার আড়ালে কার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো।

রায়বাহাদুর সে প্রসঙ্গ ছেড়ে বল্‌লেন, কিন্তু আজ আমি আপনারই সঙ্গে আত্মীয়তা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম—

দীননাথ কঠোর শ্লেষের সঙ্গে উত্তর দিলে, আমার ছেলেকে জামাই করবার পূর্বে আপনার এই চেষ্টা করা উচিত ছিল।

রায়বাহাদুর মাথা নীচু করে বল্‌লেন, দেখুন কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হলো…

—বেশ করেছেন। তার জন্যে দুঃখ জানাতে আপনাকে অনুরোধ করছি না। আমার ছেলের বিয়ের কথা আমি শুন্‌তে চাই না।—

রায়বাহাদুর কোনো রকমেই দীননাথকে শান্ত করতে পারলেন না। অগত্যা দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেন, তা হলে আমি উঠি—

…আপনার যেমন ইচ্ছা…নমস্কার…

দীননাথ রায়বাহাদুরকে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। রায়বাহাদুর ও হরিমোহন উঠে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তিনি মনস্থ করে এসেছিলেন, সেখানে সেদিন থেকে যাবেন তাই সঙ্গে বিছানা পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এমন বিপর্য্যয় ঘটবে আশা করেন নি। যাই হোক্ তাঁরা দরজার দিকে এগুলেন।

পশুপতি তখন ঘরে এসে বল্‌লে, মা ঠাকরুণ বল্‌লেন…চা খেয়ে আপনারা মুখ-হাত ধুয়ে নেন…জল-খাবার তৈরী হয়ে গেছে…

রায়বাহাদুর অত্যন্ত নম্রভাবে বল্‌লেন, তোমার মা ঠাকরুণকে আমার নমস্কার জানিয়ে বল, চা জল-খাবার খাওয়া আর হবে না…মুখুজ্যেমশাই আমাকে আত্মীয় বলে স্বীকার করতে চান না…আমি যাচ্ছি…

আবার দরজার কড়া নড়ে উঠ্‌লো। পশুপতি সেখানে গিয়ে রাজলক্ষ্মীর বক্তব্যটা শুনে বল্‌লে, মা ঠাকরুণ বলছেন, চা জল-খাবার তো খেতেই হবে। তাছাড়া—তাছাড়া—কি মা?

রাজলক্ষ্মী তার কানে কানে বলে দিলেন, বল্‌ এখানে আজ থেকে যেতে হবে।

পশুপতি রায় বাহাদুরকে বল্‌লেন, মা ঠাকরুণ বল্‌ছেন, আজ রাত্রে আপনাদের এইখানেই থাকতে হবে, কাল সকালে দুটি মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে তারপর যেতে পারবেন—

রায়বাহাদুর বিপদে পড়লেন। কি করেন, ইতস্ততঃ করায় পশুপতি আবার বল্‌লে, মা বল্‌ছেন, তিনি আপনাদের কোনো আপত্তিই শুনবেন না···

রায়বাহাদুর ও হরিমোহনের আর যাওয়া হলো না। তাঁরা আবার বসে পড়লেন। কিন্তু রায়বাহাদুর আজ বড় আঘাত পেলেন। তিনি কখনোই আশা করেননি দীননাথ তাঁর সঙ্গে এই ভাবে অভদ্র ব্যবহার করবে। তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন বৃদ্ধের দুঃখ কোথায়, কিন্তু তাহলেও অতিথির সঙ্গে এমন ব্যবহার তিনি এ-অবস্থায় পড়লে হয়তো করতেন না! হরিমোহন বল্‌লে, হুজুর, আপনার বেইমশাই বড় সুবিধের লোক নয়—

রায়বাহাদুর তাকে চুপ করিয়ে দিলেন, চুপ করে বসো, সে ভাবনা আমার!

হরিমোহন হাঁ করে বসে রইলো।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে রান্নার আয়োজন করলেন। রান্না এগিয়ে চললো তাঁর শিক্ষিত ও পটু হাতের সহায়তায়। দীননাথ রান্নাঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো। সে যেন

বুঝতেই পারেনি এতসব আয়োজন কেন! বল্‌লে, আমি এখন একটু বাইরে যাবো। শশু কোথায়, লণ্ঠনটা নিয়ে আস্‌বে—

রাজলক্ষ্মী লুচি ভাজতে ভাজতে বল্‌লেন, বেরিয়ে যেয়ো না, ভদ্রলোকেরা কি মনে করবেন—

দীননাথ অত্যন্ত অবুঝের মতো বল্‌লে, যা মনে করতে হয় করবেন—জনার্দন ভদ্রলোক ছিল না? তুমি তো এদের জন্যে খুব উৎসাহ করে লুচি ভাজ্‌ছো—ভুলে গেছো বোধ হয় জনার্দনের মেয়ে ঐ পাশের বাড়ীতে শুয়ে কাঁদছে। তার অশৌচ এখনও কাটেনি—ভুলে গেছো এরই মধ্যে সে কথা? আমি ভুলি নি—বলে ধরাগলায় দীননাথ বেরিয়ে গেল।

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্তের জন্যে অনন্যমনস্ক হয়ে, আবার নিজের কাজে লেগে গেলেন।

দীননাথ সোজা গেলো জনার্দনের বাড়ী। বাণী তখন চুপটি করে বসে ছিল জানলার ধারে।

দীননাথ পিছন থেকে ডাক্‌লে, বাণী—মা!

বাণী দীননাথকে দেখে উঠে দাঁড়ালো, তারপর দীননাথকে বিছানায় বসিয়ে সে তার পাশে বসে পড়লো।

দীননাথ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে, অত কাঁদেনা মা—ছিঃ—

বাণী কোনো কথা কইলে না—তার সে মন বা শক্তি ছিল না।

দীননাথ বলে চল্‌লো অমন মুষ্‌ড়ে পড়লে কি চলে মা? বাপতো সকলের চিরদিন থাকে না। সাহস করে সব দুঃখুকে অগ্রাহ্য করতে হয়। তুই আমার সোনার বাণী—দেখ্‌, মুখ তুলে, দেখ্‌না আমার দিকে—

বাণীর চোখ তখন জলে ভেসে যাচ্ছে।

দীননাথ বল্‌লে, একটা গল্প শুন্‌বি বাণী? ভারি মজার গল্প …দীননাথ ভাব্‌লে যদি একটা গল্প বলে, বাণীকে অন্যমনস্ক করে দিতে পারে!

বাণী তেমনি কাঁদতে লাগ্‌লো, তার সাড়া না পেয়ে দীননাথ বল্‌ল, অমন করে খালি কাঁদলে, আমি আর আস্‌বো না—

বাণী বল্‌লে, না জ্যেঠামশাই, আমি আর কাঁদবো না—

※

পরদিন সকালে ভাত খেয়ে রায়বাহাদুর হরিমোহনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে. যেতে বললেন, আমরা চললাম পশু! তোমার মা ঠাকরুণকে বলো যদি সম্ভব হতো তোমার মা ঠাকরুণের কাছে আমার মেয়েকে রেখে দিতাম। কিন্তু আমার মেয়েকে আদর দিয়ে আমিই নষ্ট করেছি…সে কোনো দিনই পরের ঘর করতে পারবে না—আচ্ছা যাই…

পশুপতি তাঁদের যাবার পথে বল্‌লে, বাবু মশায়, মা ঠাকরুণ বল্‌ছেন আপনি তাঁর বৌমার নিন্দে করবেন না আর—আর পেরথমে কেউ পরের ঘর করতে পারে না। মা ঠাকরুণ বল্‌ছেন —পরই আপন হয়—আমাদের দাদাবাবু বৌমাকে আপন করে নেবে যেমন করে হোক্—

রায়বাহাদুর বল্‌লেন, তোমার মা ঠাকরুণকে আমার নমস্কার জানিও পশু। আমি চল্‌লাম—তাঁর আশীর্বাদ আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার মেয়ের কাছে—আর পশু, তোমার কর্তাবাবুকেও আমার নমস্কার জানিও—

রায়বাহাদুর হরিমোহনকে নিয়ে পথে পা দিলেন। রাজলক্ষ্মী কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌লেন, দুর্গা, দুর্গা···

*

রায়বাহাদুর সন্ধ্যার সময় নিজের বাড়ী এসে দেখ্‌লেন— সব থম্‌থম্‌ করছে। তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। ডাক্‌লেন, লছমী···

লছমী মাথা নীচু করে এসে হাজির হলো। রায়বাহাদুর বল্‌লেন, রেখাকে একবার ডেকে দেতো—

লছমী তবুও নীরব।

—যা ডেকে দে···

লছমী ভয়ে ভয়ে বল্‌লে, মেমসাব আর জামাইবাবুকো বাড়ীমে নেহি মিলনা—

রায়বাহাদুর ত্রস্তকণ্ঠে বল্‌লেন, তার মানে ?···

লছমী জানালে, আজ সুবে সে উনলোকো কো নেহি দেখহি পড়া—

রায়বাহাদুর বাড়ীর সব ভৃত্যকে ডাকালেন। রেগে উত্তেজিত গলায় ধমকে বল্‌লেন, তোমরা কেউ জানো না কোথায় চলে গেছে তারা ?···

দরওয়ান অত্যন্ত ভীতস্বরে জবাব দিলে হুজুর ম্যায় উসিবকৎ থোড়া বাহার গিয়া থা—

রায়বাহাদুর বজ্রগম্ভীরস্বরে বল্‌লেন, কেঁও বাহার গিয়া ? কেয়া— সবকোই উসিবকৎ বাহার গিয়া ? তারপর আরো জোরে বললেন, আভিতক খাড়া কেঁও হ্যায় ? যাও বাহার যাও— নিকাল যাও বাড়ীসে—

দরওয়ানের সঙ্গে সব চাকরবাকর আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

রায়বাহাদুর অফিসঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন এমন সময় শশিশেখর প্রবেশ করলেন ব'লতে ব'লতে দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী—মা ব্রহ্মময়ী —ওহে, এক কাপ চা —

রায়বাহাদুর তাকে ধমক দিয়ে বললেন, শুনুন, খুব ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন—সে পালিয়েছে রেখাকে সঙ্গে করে, জোর জবরদস্তি করে...

শশিশেখর নির্লিপ্তভাবে বললেন, কার কাছে শুনলেন?

— এ-কথা কারোর কাছে শুনতে হয় না, নিজেই বোঝা যায়!

শশিশেখর সেই একইভাবে বললেন, আজ্ঞে তা একটু জোর, জবরদস্তি করতে হয়েছিলো, আমিই তো ট্যাক্সি ডেকে দিলাম—

রায়বাহাদুর বুঝতে পারলেন না, মাটিতে পা দিয়ে আছেন না অন্য কোথাও! বললেন, আপনি ট্যাক্সি ডেকে দিলেন!

—হ্যাঁ আমি—

রায়বাহাদুর গম্ভীরভাবে বললেন, বটে! ষড়যন্ত্র!

শশিশেখর ভালোমানুষের মতো বললেন, আজ্ঞে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া ষড়যন্ত্র!

রায়বাহাদুর বললেন, কিন্তু আমার সঙ্গে কি সর্ত ছিল?

শশিশেখর বিজ্ঞের মতন জানালেন, আজ্ঞে সে কথা বললাম সুরেশবাবুকে, যে সুরেশবাবু সর্ত মানে Condition; তা আমায় উত্তর দিলেন যে বিয়ের আগে রায়বাহাদুরের সঙ্গে যে সর্ত করেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশী ইম্পর্টেণ্টো (Important) হচ্ছে স্ত্রীর মঙ্গল;—উকিল কি না—একেবারে হাইকোর্টের আরগুমেণ্টো (Argument)—

রায়বাহাদুর তীব্রস্বরে বল্লেন, জানেন, কোথায় গেছে তারা ?

শশিশেখর ধীরে সুস্থে বললেন, এই নেন আমি হাওড়ায় গিয়ে টিকিট কেটে গাড়ীতে চাপিয়ে দিলাম !

—কোথায় গেছে !

শশিশেখর বল্লেন, আজ্ঞে চট্‌বেন না—দুর্গা—মা রণ-রংগিণী—ঐ ইয়েতে গেছে—এখান থেকে একশো মাইল, মানে ওদেরই দেশের কাছে মহকুমা সহরে ; সেখানে সাবডিভিজনে কোর্ট আছে। বল্লে ঐখানেই ছোট্ট বাসা করে স্ত্রীকে রাখ্‌বো, আর ওই কোর্টেই প্যাক্‌টিস্ (Practice) করবো।

রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে বল্লেন, প্যাক্‌টিস্ করুক কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে থাকা হবে না। চলুন আমাকে নিয়ে সেই সাবডিভিজন টাউনে—শশিশেখর সহজগলায় বল্লেন, তাই চলুন দুজনকেই ফিরিয়ে নিয়ে আসি—রায়বাহাদুর জানালেন ; দুজনকেই ফিরিয়ে আনবো কি, একজনকে আনবো, কি কাউকেই আনবো না, সে আমি বুঝবো—

শশিশেখর এমন ভাবখানা দেখালেন যেনো তিনি বাঁচলেন। বল্লেন, সেই ভাল ! চলুন, কেউ যদি না আসে, আমরাই না হয় ফিরে আস্‌বো। জয় মা ধূমাবতী, মা রণরংগিণী···

—নয়—

আগাছাপরগাছায় ঘেরা একখানা পুরাতন পড়ো বাড়ী। বাড়ীখানা বোধ হয় এককালে বড় ছিল, ঘরগুলো দেখে সেরকম আন্দাজ করা যেতে পারে। সকালবেলাতেও ঘরগুলি অন্ধকার!

সুরেশ এই বাড়ীর একখানা বড় ঘরে দাঁড়িয়ে বিছানাগুলো তুলে তুলে রাখছিলো একখানা ভাঙা তক্তপোষের ওপর। রেখা ঘরের এককোণে দাঁড়িয়েছিলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহ্য হয়ে, সে এগিয়ে এলো সুরেশের সামনে! তার সারা মুখ রাগে লাল! বল্‌লে, এই আমায় বেড়াতে নিয়ে আসা?

সুরেশ নিরুত্তর হয়ে, একখানা ভাঙা চেয়ারের ওপর তার কোটটা খুলে রাখ্‌লে।

রেখা আবার বল্‌লে, তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছো!

সুরেশ চট্ করে বল্‌লে, বেশ করেছি; স্ত্রীকে নিয়ে এসেছি বলে সমাজ চেঁচিয়ে মাথা খারাপ করবে না।

রেখা আবার জিজ্ঞাসা করলে, কেন এনেছো আমাকে!

—আমার খুসী—

সুরেশ সেই চেয়ারে বসে পড়লো।

রেখা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, আবার বল্‌লে, তুমি কোথায় নিয়ে এলে?

—আমাদের দেশের সাবডিভিজন টাউনে—

রেখা রেগে বল্‌লে, আমি এখানে থাক্‌বো না—কেন আমায় নিয়ে এলে?

সুরেশ গম্ভীরভাবে বল্লে, এখানেই থাক্‌বে তুমি।

—এই ভাঙ্গা পড়ো বাড়ীতে ?

—হ্যাঁ !

রেখা জোরে বল্লে, তোমার কথায় ?

—হ্যাঁ আমার কথায়—

রেখা হাত নাড়তে নাড়তে বল্লে, ওরে,—কক্ষনো না—আমি পুলিশে খবর দেবো—

সুরেশ সঙ্গে সঙ্গে বল্লে, আমি নিজেই পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছি, যে আমার স্ত্রী পাগল, তাই তাকে খানিকটা জোর জবরদস্তি করতে হয়—

রেখা রেগে উঠ্‌লো, বটে ! আমি চেঁচাবো—

—যত পারো চেঁচাতে পারো ; এখান থেকে আট মাইলের মধ্যে কোনোও লোকালয় নেই, এখানে কেউ যাতায়াতও করে না—এ বাগানকে লোকে ভুতের বাগান বলে—

সুরেশ কথা শেষ করেছে এমন সময় বাইরে একটা মচ্‌মচ্‌ শব্দ হলো। রেখা ভয়ে আঁতকে উঠলো। বল্লে, মাগো ভুত !

রেখা সুরেশকে জাপটে ধরলে—তার মুখ সুরেশের বুকে রেখে কম্পিত স্বরে বল্লে, আমায় বাঁচাও বাঁচাও।

সুরেশ কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে না। কিন্তু বুঝতেও পারলে না কোথা থেকে মচ্‌মচ্‌ শব্দটা হলো।

মচ্‌মচ্‌ শব্দ হবার কারণ ছিলো। রায়বাহাদুর এবং শশিশেখর ভাঙ্গা দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা খুব সন্তর্পণে এগুতে লাগলেন। শশিশেখর জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে দেখে রায়বাহাদুরকে ডাকলেন, হুজুর…

রায়বাহাদুর তার কাছে এলে বললেন, ঐ দেখুন!

রায়বাহাদুর দেখলেন রেখা সুরেশকে আঁকরে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। শশিশেখরের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। কোনো কথা বোধ হয় বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রায়বাহাদুর নিষেধ করলেন। তারপর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, কিছুই বুঝতে পারছি না—

শশিশেখর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, আজ্ঞে এর মধ্যে দুর্বোধ্য কোন্ জিনিষটা?

রায়বাহাদুর বল্‌লেন, সবটাই—কিন্তু খুকীকে এই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়—।

শশিশেখর সুর মিলিয়ে বললেন, অসম্ভব!

—অসম্ভব কেন! খুকী যদি তার স্বামীর সঙ্গে থাক্‌তে চায় তো ভালোই—

শশিশেখর কপাল গুটিয়ে বল্‌লেন, ভাল কি করে হবে? আপনার মেয়ে যদি বলে যে আর কোলকাতায় ফিরে যাবো না?

রায়বাহাদুর দূরের দিকে দৃষ্টি রেখে বল্‌লেন, তাহলে বুঝ্‌বো তার শাশুড়ীর আশীর্বাদ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে—

শশিশেখর একটা বিড়ি ধরিয়ে এগিয়ে চল্‌লেন। রায়বাহাদুর আবার বল্‌লেন, আপনি এইখানেই একটা ছোটখাট বাড়ীর সন্ধান দেখুন—আমি ক'দিন এইখানেই থাকবো—একটু লক্ষ্য রাখতে চাই—কি যে ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারছি না—

শশিশেখর বল্‌লেন, আচ্ছা তাই হবে; হ্যাঁ একটু লক্ষ্য রাখা দরকার বই কি, আবার যদি কোথাও পালিয়ে যায়?

রায়বাহাদুর একটি তীব্র কটাক্ষ করলেন শশিশেখরের দিকে। শশিশেখর চুপ করে গেলেন।

*

একটু পরেই রেখা সুরেশকে আলিঙ্গনাবস্থায় থেকেই জিজ্ঞাসা করলে, চলে গেছে ?

—কে ?

—ভূত ?

—হ্যাঁ। সুরেশ জবাব দিলে। রেখা তক্ষুনি সুরেশকে ছেড়ে দিয়ে বললে, তুমি আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবে কি না !

—বলছি তো না। বারবার এক কথা ভাল লাগে না !

রেখা আবার চিড়বিড়িয়ে উঠে বল্‌লে, ওরে, আবার গরম দেখায় রে ! ওসব আমার কাছে চলবে না। বুঝলে ?

সুরেশ উত্তর দিল না।

বেলা গড়িয়ে চললো। গ্রামের মাথায় সূর্য উঠলো। সকাল থেকে খাওয়া হয় নি কারোরই। আবার এদিকে রান্নার ব্যবস্থাও করা হয় নি।

রেখা তক্তপোষের ওপর থেকে বল্‌লে, ক্ষিদে পেয়েছে যে—

সুরেশ একটা কৌটো দেখিয়ে বল্‌লে খাওনা, ওর মধ্যে সেই ষ্টেশনের লুচি আছে !

—ওরে ! আমি বুঝি ঐ অখাদ্যগুলো খাবো ?

—অখাদ্যগুলোতো আমিও খাবো—

রেখা সরাসরি জবাব দিলে, তোমার ও-সব খাওয়া অভ্যেস থাকতে পারে, আমার নেই—

সুরেশ পাল্টা উত্তর দিলে, তাহলে অনশন অভ্যেস করো, আর কোনো উপায় নেই।

রেখা খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো। সুরেশ তক্তপোষের একধারে বসে একখানা বাংলা পত্রিকা পড়তে লাগ্‌লো। রেখা নিঃশব্দে উঠে কৌটোটা থেকে চারখানা লুচি আলুর তরকারী নিয়ে খেতে লাগলো। সুরেশ দেখে ওপাশ ফিরে মুচকি হাস্‌লে—

রেখা কোনোরকমে খেয়ে নিয়ে, আবার এসে বসলো তক্তপোষের ধারে। সুরেশ এবার বল্‌লে, অখাদ্যগুলো খেলে যে ?

রেখা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, তোমার কি ?

সুরেশ মুচকি হেসে বল্‌লে, আমার কিছু নয়, তবে যা ছিল সব শেষ করনি তো ? আমাকেও খেতে হবে !

রেখা জবাব দিলে, আমার বয়ে গেছে ওসব বাজে জিনিষ বেশী খেতে। মাগো কি বিচ্ছিরি খেতে—আমি বলে দিচ্ছি ও-সব খেতে দিলে আমি মরে যাবো—

সুরেশ কোনো উত্তর দিলে না।

রেখা একটা বালিশ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো।

আরও বেলা পড়তে লাগলো। সুরেশ বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরেটা বড় নির্জন ; খাঁ খাঁ করছে মাঠ,—তার ওপর জায়গায় জায়গায় ঘন জঙ্গল।

সূর্য ডুবে গেলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সব কালো হয়ে গেলে। সুরেশ বারান্দায় চুপ করে বসে রইলো।

সন্ধ্যা বাড়তে বাড়তে রাত্রি হয়ে এলো। ঘরে ভাঙ্গা জানালা দিয়ে আবছা আলো ঘরে প্রবেশ করতে লাগলো। রেখা তক্তপোষের উপর চুপচাপ বসেছিলো। সুরেশ প্রবেশ করলে।

রাত্রিতেও রাঁধা হলো না। ষ্টেশনের লুচির যে অংশ অবশিষ্ট ছিল তাই খেতে হল দু'জনকে।

সুরেশ হাতঘড়িতে দেখলে বারোটা বেজেছে। সে তক্তপোষের ওপর চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। রেখা উঠে গিয়ে আর একখানা বড় চৌকির উপর গিয়ে বসলো।

রেখা নিজের কাপড়ের আঁচলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে ঠায় বসে রইলো। তার সারা মুখে উৎকণ্ঠা—

আশেপাশে খস্ খস্ করে শব্দ হচ্ছে আর রেখা শিউরে উঠছে। একটু পরে দূরের জঙ্গল থেকে শিয়ালগুলো ডেকে উঠলো, 'হুক্কা হুয়া—' রেখা নিজেকে আরও ছোট করে গুটিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে বাবা, মাগো। গাছের পাতার হিস্‌হিস্ শব্দ, পুকুরের জলে শিয়ালের জল খাওয়ার চক্‌চক্ শব্দ রেখাকে ভয়ে কাঠ করে দিলে। রেখা একবার সুরেশের বিছানায় গিয়ে বসলো তারপর উঠে এলো সেখান থেকে নিজের চৌকীতে।

আবার গোঁ-গোঁ শব্দ। শিপ্ শিপ্—ক্রু-ক্রু—রেখা আঁতকে উঠলো।

ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁ ঝাঁ ঝাঁ—

রেখা চৌকী থেকে উঠে একখানা পায়াভাঙ্গা চেয়ারে বসলো। সামনে চোখ পড়তে সে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ—ওরে বাঘ, বাঘ! মেরে ফেল্লেরে বাঘ···

তখন জানালা দিয়ে একটা বিপুল কালো বিড়াল ঘরে ঢুকছিলো। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে চেয়ারে আঁচল আটকে চেয়ার সুদ্ধু উল্টে গেলো মাটির ওপর। সুরেশ জেগেই ছিল—

সে চুপচাপ মজাটা উপভোগ করলে। রেখা ভয়ে ভয়ে মাটি থেকে উঠে সুরেশের পিঠের ওপর শুয়ে পড়লো। সুরেশ আড়মোড়া ছলে কাৎ হয়ে গেলো। রেখা তার পিঠে দু-তিনটা চাপড় মারতে সুরেশ চোখ খুলে বল্‌লে, কি হচ্ছে রাত্তিরে?

—এক্ষুণি একটা বাঘ এসেছিলো—রেখার মুখে তখনো ভয়ের চিহ্ন।

সুরেশ বল্‌লে, বাঘ এখানে আসবে কোথা থেকে? পাগল না কি?

—দেখো পাগল - পাগল করো না—

—তবে যাও, শুয়ে পড়ো-গে যাও। রাত্তিরে একটু ঘুমোতেও দেবে না?

রেখা সুরেশের পাশ থেকে উঠলো না। সে বরং আরও নিবিড় ভাবে সরে গিয়ে বল্‌লে, রাত কত এখন?

সুরেশ উত্তর দিলে, দুটো আড়াইটে হবে—'

রেখা একটু যেন অভিমানহত গলায় বল্‌লে, সমস্ত রাত জেগে বসে আছি, শুনতে পাচ্ছোনা, এতো ডাকছি? আমার বড্ড ভয় করছে—

—তা আমি কি করবো?

রেখা আবার বল্‌লে, কি সব ডাকছে চারিধারে, আমি শুতে পাচ্ছি না—

—না শোবে তো বক্‌বক্ করো না।

রেখা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর বল্‌লে, শুনতে পাচ্ছো আমার ভয় করছে—

—শুনেছি!

রেখা ঠোঁট ফুলিয়ে বল্‌লে, ছাই শুনেছো ! ভারি বাহাদুর ! ভয় দেখাতে পারো—ভয় ভাঙ্গাতে পারো না ?

সুরেশ এ-পাশে ফিরে বল্‌লে, পারি, যদি তুমি আমার সমস্ত কথা শোনো।

রেখা প্রশ্ন করলে, সমস্ত কথা মানে ?

—আমি যা বল্‌বো, তোমায় তাই করতে হবে।

—ওরে ! তার মানে ?

—তার মানে তোমায় এখানে সংসার পাততে হবে, রাঁধতে হবে—

রেখা দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, রাঁধতে হবে—

সুরেশ দ্বিতীয় নম্বর কাজ বললে, ঘর ঝাঁট দিতে হবে—

—আমি Sweeper নাকি ?

সুরেশ বলে চল্‌লো, জল তুলতে হবে, বাসন মাজতে হবে—

রেখা তার স্বভাব ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো, বটে ! না, আমি কিছু করবো না। আমি তোমার কোন কথা শুন্‌বো না। না, না—

সুরেশ বল্‌লে, না শোনো, না শুনবে। কিন্তু বলে দিচ্ছি রোজ ঘ্যান ঘ্যান কর্‌তে পাবে না—

রেখা জিদের সুরে বল্‌লে, আমার ভয় পেলেই আমি চেঁচাবো।

সুরেশ আর কোনো কথা বল্‌লো না। সে চাদরমুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। রেখা খানিক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, এক সময় সুরেশের পাশে শুয়ে পড়লো।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রেখা সুরেশকে দেখতে পেলে না। তার অবস্থা তখন সঙ্গীন। সে ঘুপটি মেরে ঘরের এক

কোণে বসে রইলো। একটু পরে সুরেশ ফিরে এলো ;—তার সঙ্গে লম্বা রোগা একটা লোক।

রেখা মাথায় ঘোমটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলে ?

—গিয়েছিলুম পেটের চিন্তায়। চাল ডাল চাইতো, না কি ! বলে সে রোগা লোকটির হাত থেকে পুঁটুলি বাঁধা মালগুলো নামালো, রোগা লোকটি হিঁ হিঁ করে হেসে বললে, আজ্ঞে আমি উকিলবাবুর মুহুরি—হিঁ হিঁ –

রেখা নাকি সুরের বহর দেখে ঘাবড়ে গেলো। সুরেশ রোগা লোকটিকে বললে, ওহে জগন্নাথ, তুমি আমার বাড়ীর আনা-নেওয়া করবে বুঝলে ?

—আজ্ঞে !

জগন্নাথ চলে গেলো !

সুরেশ বললে, কি আজ রান্না চড়াবে তো' না শুকিয়ে থাকবে ?

—আমি ও সব পারবো না—

—না পারো তবে বসে থাকো ; আমি কিছু খেয়ে নেবো'খন কোর্টে।

রেখা মৃদুস্বরে বললে, আমাকে শুকিয়ে রেখে ?

—তা আর কি করবো ? আমি তোমার জন্যে অত ভাবতে পারবো না।

রেখা বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ হলো। সুরেশ তার কাছে সরে এসে বললে কি রাঁধবে ?

রেখা আর কোনো কথা না বলে রান্নাঘরে ঢুকলো। [illegible]

এবং ভ্যাপসা গন্ধ চারিধারে। রেখা কতকালের এক পুরোনো উনুনেই লেগে গেলো রাঁধতে।

সুরেশ রেখার হাতে রাঁধা ভাত তা খেয়ে তৃপ্ত হলো। ভাত সিদ্ধ হয় নি, ডালে নুন হয় নি—এজন্যে সে অনুযোগ জানালে না। শুধু বল্‌লে, বাঃ ভারি সুন্দর রেঁধেছ তো?

রেখা ফিক্‌ করে হেসে ফেলেই মুখ গম্ভীর করে বল্‌লে, ঠাট্টা করতে হবে না তোমায়। আমি জানি রান্না ভাল হয় নি।

সুরেশ কোর্টে চলে গেলো।

রেখা তার নিজের হাতের রান্না করা ভাত ডাল খেয়ে হাস্‌বে কি কাঁদবে ভেবে পেলে না। শুধু প্রতিজ্ঞা করলে সে এর চেয়ে ভালো করে রাঁধবে।

দুপুর বেলা সে বিছানা পরিষ্কার করতে লেগে গেল। আলনায় জামাকাপড়গুলো সাজিয়ে ফেল্‌লে। তক্তপোষখানা ঝেড়ে বিছানা সমান করে নিলে তারপর একটা ঝাঁটা নিয়ে, মুখে রুমাল বেঁধে ঘরের কুলুঙ্গী ও আশেপাশে ঝাড়তে লাগলো। যত ধূলো ওড়ে আর সে কাশে—

একটু পরে সে শুয়ে পড়লো; কিন্তু কি ভেবে আবার উঠে পড়লো। খিড়কার পুকুর থেকে একটা পিতলের কলসী করে জল আনলে—

এদিক ওদিক কাজ করতে করতে বোধ হয় বেলা চারটে বেজে গেল। রেখা ঝাঁটা নিয়ে এসে বারান্দায় জল ঢেলে ঘষতে লাগলো। সে ঝাঁট দিতে দিতে পিছলে পড়ে গেলো। মুখ তুল্‌তে দেখে সুরেশ দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছে; সে সবে কোর্ট থেকে ফিরেছে। রেখা বারবার ওঠবার চেষ্টা করতে

লাগলো কিন্তু যতবার উঠতে যায় ততবার পিছলে পড়ে যায়। বার-তিনেক পড়ার পরও সুরেশ সাহায্য করতে এলো না দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, ওরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে রে—

সুরেশ মিট্ মিট্ করে হাসছিলো। রেখা আবার বললে, ওরে তুলবে না. না কি রে।

সুরেশ এইবার এগিয়ে এসে তাকে তুলে নিলে। আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে গেল ঘরে। রেখার গাময় কাদা লেগে গেছে, কাপড় ছিঁড়ে গেছে, মুখে ছাপ ছাপ ঝুল লেগে গেছে! সুরেশের একটু দুঃখু হলো। সে রেখার দুঃখে সমবেদনা জানিয়ে বললে, খুব লেগেছে বুঝি ?

রেখা ঝাঁজিয়ে উঠলো, বলতে লজ্জা করে না ?

—আমি কি করবো বলো ?

রেখা তারপরই সুরেশের বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেললে ছোট মেয়ের মত। সুরেশ তাকে সান্ত্বনা দিলে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে। রেখা এই প্রথম এমন করে কাঁদলে! সুরেশ তাকে তক্তপোষের ওপর বসিয়ে বললে, যাও কাপড় ছেড়ে এসো। আমি বললুম বলেই কি অমনি বাইরে ঝাঁট দিতে যেতে হবে ?

রেখা কিছুতেই গেলো না। সুরেশ তার চিবুক ধরে বললে যাও, কাপড় জলে ভিজে গেছে, গাময় কাদা—

রেখা ধীরে ধীরে চলে গেল। সুরেশ আজ একটু আত্ম-প্রসাদ উপভোগ করলো। কিন্তু রেখাকে কষ্ট দিয়েছে বলে সে নিজের কাছে ক্ষমা চাইলে।

সেদিন সুরেশ বিকেলে বারান্দায় বসে ছিল এমন সময় সেখানে এলো জগন্নাথ। তার হাতে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন।

—কি চাই ?

—আঁজ্ঞে লণ্ঠনটা...

সুরেশ বললে, বাঃ, তোমার বেশ বুদ্ধিতো লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছো, এই দিনের বেলায় ?

জগন্নাথ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, আঁজ্ঞে কাজটা সেঁরে দিঁয়ে গেলুম ; আমি আজ সন্ধ্যের সময় থাক্‌বো না কিঁনা—

—তাই বিকেল পাঁচটার সময় ঘরে আলো জ্বেলে বসে থাক্‌তে হবে ! কেন, সন্ধ্যাবেলা থাক্‌বে না কেন ?

জগন্নাথ জবাব দিলে, আজ্ঞে পূঁব পাড়ায় আঁজ যে যাত্রা হবে। খুঁব ভালো যাঁত্রার দল এসেছে—রঁসিকদাঁসের দল ! পালা হবে সিন্ধুমুনি বই। সঁবাই এসেঁছে—রসিকদাঁস, নটবর গাঁইয়ে, টেকো পানকেঁষ্টো, দীননাথ—আজ ছুঁটি দিন আমায়—

সুরেশ মাথা নীচু করে বললে, আচ্ছা যাও।

তারপর জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো। তার বাবা এখনো যাত্রার দলে ? শরীর খারাপ, তবুও ? আজ তার নিজেকে দোষী মনে হলো কিন্তু...

রেখা প্রবেশ করলে ঘরে, এককাপ চা নিয়ে। বললে, তোমার চা—

সুরেশ মুখ ফিরিয়ে বললে, আচ্ছা রেখে যাও—

রেখা চা রেখে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলো।

—দশ—

পূবপাড়ায় তখন হৈ হৈ কাণ্ড! সবে বিকেল, যাত্রার কোথাই বা কি তখন—কিন্তু লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে যাত্রা আরম্ভ হবার প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগেই। রসিকদাসের দল, তার ওপর বহুবিখ্যাত দীননাথ! এ যেনো সোনায় সোহাগা। সকলের মুখে মুখে রসিক আর দীননাথ—

দীননাথ একখানা লম্বা ধরণের ঘরে বসে রসিকদাসের সঙ্গে কথা কইছিলো। সে-ঘরটাকে সাজঘরই বলা যায়;—তার ওপর এদিকে ওদিকে, চারিদিকে বাজনার যন্ত্রপাতি। দীননাথ বলছিলো, রসিকভায়া আজ আমার ভারি আনন্দের দিন। কাউকে বলো না ভাই, আজ এখানে আসবার আগে খবর পেলুম বাণীকে বরপক্ষের পছন্দ হয়েছে। মস্ত বড় জমীদারের ছেলে—কিন্তু ভারি ভালো। তাকে যখন জানালাম আমরা গরীব, সে বললে, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনবো; মেয়ে কিনতে তো আর যাচ্ছি না! ভাগ্য, বাণীর ভাগ্য! কেবল দুঃখু রইলো, জনার্দন দেখে যেতে পারলে না ওর মেয়ের সুখ—! এইবার রসিকভায়া আমারও ছুটী নেবার দিন এসেছে। আর দু'দশদিন যাত্রা করেই ব্যস্…একেবারে ছুটী। না ভাই তুমি মুখ কাঁচুমাচু করো না—

এমন সময় নটবর এসে বললে, দীনুদা তবলাটা একটু বেঁধে দাও। এখন এ-সব কাজগুলো ঠিক হয়ে থাক, কি বলো?

নটবর তবলা আর হাতুড়ী এনে দিলে দীননাথকে। রসিকলাল কার্যান্তরে প্রস্থান করলে, নটবরকেও সঙ্গে নিলে।

দীননাথ ঠুক ঠুক করে তবলা বাঁধতে লাগলো। আর মনে

করতে লাগলো বাণীর আসন্ন বিবাহের কথা। কতবার বাণী তাকে বলেছে, জ্যেঠামশাই, তুমি আমার জন্যে কেনো অত খাটবে? দীননাথ জবাব দিয়েছে, দুষ্টু মেয়ে চুপ কর্, আমি না খাটলে তোর জন্যে খাটবে কে বল্‌তো?

দীননাথ কত আদর জানিয়ে আবার বলেছে, হ্যাঁরে বিয়ের পর আমায় মনে রাখবি তো?

বাণী তখন ওকে মাথা দোলাতে দোলাতে বলেছিলো, কি যে বলো জ্যেঠু···

দীননাথ দেখে মানসে সেই বাণীর বিয়ে—কেমন সাজবে সে! দীননাথ মনে মনে বললে, বাণীমাকে যে দেখতো তারই পছন্দ হয়ে যেতো, যা নামে বাণী, রূপে-গুণেও সরস্বতী! এই প্রসঙ্গে তার মনে পড়ে গেলো সুরেশের কথা। তার কপাল কুঁচকে গেলো। আজও সে সুরেশকে ক্ষমা করেনি।

আনমনা হয়ে দীননাথ বেহালা মিলিয়ে চললো টুন্ টুন্ আওয়াজ করে!

ঘরে প্রবেশ করলে প্রাণকেষ্টো। দীননাথকে প্রাণকেষ্টো কোনোদিনই ভালোবাসতো না; তার কারণও ছিলো। দীননাথের জন্যে তার আর অন্ধমুনির পার্ট করা হতো না! লোকেও চাইতো দীননাথকে খুব। প্রাণকেষ্টো ঘরে ঢুকে যা-তা বক্‌তে আরম্ভ করে দিলে—দীননাথকে টিটকারী করে কথা বলা তার স্বভাবগত হয়ে গিয়েছিল।

প্রাণকেষ্টো বল্‌লে, কিহে যাত্রা করতে এলে তো?

—আসুক না কেন আর তাতে তোমার কি? তুমি বলবেই বা কেন?

প্রাণকেষ্টো মুখ টিপে হেসে বল্‌লে, কেন বল্‌বো না, একশো-বার বলবো ; সেই তো এ্যাক্টো করতে আস্‌তে হলো তবে আগে অত ন্যাকামী করছিলে কেন,—আর যাত্রার দলে যাব না—ছেলে হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট···তার কত রোজগার—মান সম্ভ্রম···

দীননাথ তবলা বাঁধতে বাঁধতে বল্‌লে, প্রাণকেষ্টো আমি যাত্রার দলে এলে তুমি পার্ট করতে পারো না বলে, গাল দিতে হয় আমায় দাও, আমার ছেলের সম্বন্ধে কিছু বলোনা তুমি—

প্রাণকেষ্টো ভেংচি কেটে বল্‌লে, উঃ কত দরদ ছেলের! এদিকে বড়লোকের ঘর জামাই হয়ে বাপকে কলা দেখাচ্ছে! বলে সে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে দীননাথকে কলা দেখালে।

দীননাথ এবার একটু বিরক্ত হলো, অনুযোগ করলে, তাতে তোমার কি? আমার ছেলে, বড়লোকের ঘরজামাই হোক, তাতে তোমার কি?

প্রাণকেষ্টো বদমাইসী হাসি হাসতে হাসতে বললে, আমার আছে বই কি! তোমার থোতা মুখ ভোঁতা হয়েছে—ছেলেতো তোমাকেই হাইকোর্ট দেখিয়ে দিয়েছে—

দীননাথ রেগে গেলো। সে চেঁচিয়ে বললে, প্রাণকেষ্টো!

প্রাণকেষ্টো দাঁত বের করে বল্‌লে, এঃ মারবে নাকি হে! ভারি চোখ রাঙাচ্ছ যে! এখনো ছেলের জন্যে তেজ দেখো—পরকে মারবে না? নিজের ছেলে যে এখন শ্বশুরকে বাপ বলছে···

দীননাথ আবার চেঁচিয়ে উঠল, প্রাণকেষ্টো!

কিন্তু প্রাণকেষ্টো এক কথাই বারবার বলতে লাগলো। দীননাথ আর থাকতে না পেরে তবলা বাঁধা হাতুড়ীটা মারল

ছুঁড়ে প্রাণকেষ্টোর দিকে ! প্রাণকেষ্টোর কপাল কেটে গেলো। প্রাণকেষ্টো চেঁচিয়ে উঠলো, ওগো আমায় দীনু খুন কল্লে—উঃ রক্ত—এ যে সত্যিই রক্ত—ও মা !—বলে সে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। গোলমাল শুনে রসিকলাল দৌড়ে ঘরে প্রবেশ করলে, বললে, কি হলো, কি হলো ! একি—কে মারলে এমন করে ?

দীননাথ চীৎকার করে বল্লে, আমি—আমি মেরেছি ; পুলিশ ডাকো, আমি বলবো আমি খুন করেছি।

যাত্রার দলের সব লোকেরা এক এক করে এসে ভীড় করতে আরম্ভ করলে। দীননাথ তক্তপোষের ওপর বসে হাঁফাচ্ছিলো।

কে একজন বুঝি থানায় খবর দিয়ে এসেছিলো ! পুলিশ এলো জন চারেক। দীননাথকে দু'একটা প্রশ্ন করতে দীননাথ জবাব দিলে, আমি মেরেছি !

পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে চল্লো। দীননাথ রসিককে বললে, ভাই, একটা কাজ করো ; বাড়ীতে···আচ্ছা, না থাক্··· চলো থানায় ! রসিকলাল দীননাথের বাড়ীতে একজন লোক পাঠিয়ে দিলে।

দীননাথ থানায় এসে হাজির হলো। কেউ তার হয়ে জামিন দিলে না ; অগত্যা তাকে হাজতে থাকতে হলো। দীননাথ সেই ছোট্ট ঘরে বসে ভাবতে চেষ্টা করলে আদ্যোপান্ত ঘটনাটা। কে দোষী ? প্রাণকেষ্টো কেবল তার ছেলের নামে যা-তা বলবে, বলে কিনা,—ছেলে যে এখন শ্বশুরকে বাপ বলছে ! উঃ এতদূর স্পর্দ্ধা ! দীননাথ রেগে উঠলো দপ করে। কিন্তু আবার মিইয়ে গেলো। সবচেয়ে বেশী সে আশ্চর্য হলো এই

ভেবে সে সুরেশের জন্যেই তো সে এমন একটা বিপজ্জনক কাজ করে ফেললে! সুরশকে কি সে সত্যই ভালোবাসে না? দীননাথ কঠোর ভাবে মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগ্‌লো: না আমি সুরেশকে ভালোবাসি না। আমি···

বারবার এইসব কথা ভাবতে গিয়ে দীননাথ পাগলের মতো হ'য়ে গেলো।

*

পরদিন স্থির হলো যে দুদিন পর এ অপরাধের বিচার হবে!

*

দুদিন পরে বিচার আরম্ভ হলো!

বিচারের দিন সকালবেলা রাজলক্ষ্মী পশুকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এলেন। তাঁরা একটা বিরাট বটবৃক্ষের নীচে বাসা বাঁধলেন!

এস্‌-ডি-ও দীননাথকে বল্‌লেন, তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করছো তুমি দোষী?

দীননাথ বল্‌লে, হ্যাঁ হুজুর, আমি দোষী, আমি স্বীকার করছি আমি দোষী।

এস্‌-ডি-ও আবার বল্‌লেন, কি স্বীকার করছো তুমি? প্রাণকেষ্টো অভিযোগ করছে তোমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে খুন করা;—তুমি সে কথা স্বীকার করছো?

ফরিয়াদীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রাণকেষ্টো দীননাথের দিকে মুখ ভ্যাংচালে!

দীননাথ বিস্মিত ভাবে বল্‌লে, খুন! খুন! সে আশ্চর্য হলো, তার এমনও একটা অপরাধ হতে পারে—!

এস্‌-ডি-ও বল্‌লেন, হুঁ, তোমার উকিল নেই কেউ?

—না হুজুর—আমার উকিল-মোক্তার নেই —আমি বড় গরীব—আমার কেউ নেই—কেউ নেই—

এস্-ডি-ও গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, আদালতে মিথ্যা বলো না, আদালত শুনেছে তোমার ছেলে আছে, আর তার কথা নিয়েই প্রাণকেষ্টোর সঙ্গে তোমার বচসা হয়—তোমার উকিল সত্যিই নেই ?

এমন সময়ে সেখানে উঠে দাঁড়ালো সুরেশ ! সে বল্‌লে, **your honour—**

এস্-ডি-ও তার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, কি, বলুন !

সুরেশ জানালে, আমি **accused** এর পক্ষে এ্যাডভোকেট্—

—আপনি ?

—আমি **Calcutta High Cour** এ প্রাকটিস্ করি—

—**Good.**

দীননাথ চেঁচিয়ে উঠলো, আমি উকিল দেবো না—আমি উকিল দেবো না। আমি স্বীকার করছি যে প্রাণকেষ্টো যা বলেছে সব সত্যি !

এস্-ডি-ও হুকুম দিলেন, চুপ করো তুমি ! ফরিয়াদীর **lawyer** কে ?

ফরিয়াদী পক্ষের উকিল দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, আমি হুজুর।

—ও কালীবাবু ! আমি এ **Case** শুন্‌বো কাল ; আপনার সাক্ষীদের নিয়ে আস্‌বেন। তারপর দীননাথের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, তুমি আজ গ্রামে ফিরে যেতে পারো, তোমার জামীন ?

সুরেশ জানালে, আমি, **Your honour !**

—**Good** ।

এস্‌-ডি-ও জানালেন, কাল ঠিক এই সময় আসবেন।

দীননাথ কম্পিত স্বরে বল্‌তে লাগলো, আমি গ্রামে ফিরে যাবো না হুজুর। আমার স্ত্রী এখানে এসেছে, ঐ বাগানে। আমার জামীনের দরকার নেই—আমি—আমার উকিলের দরকার নেই হুজুর—আমার কারোর দরকার নেই—

দীননাথ রসিকলালের সঙ্গে বটবৃক্ষতলায় এলো। দীননাথকে পৌঁছে দিয়ে রসিক চলে গেলো। রাজলক্ষ্মী বল্‌লেন, শেষ হলো বিচার?

—না কাল শেষ হবে!

—উকিল ঠিক করেছো?

দীননাথ কি যেনো ভেবে নিলে, তারপর বল্‌লে, কে যেন একজন গায়ে পড়ে আমার উকিল হলো!

রাজলক্ষ্মীর কাছে দীননাথের কথার সুরটা বিশেষ ভাল লাগলো না। কিন্তু তিনি আর কোনো প্রশ্নও করলেন না।

দীননাথ ঘাসের ওপর বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলো সুরেশ এসেছে তাকে বাঁচাতে, তার ছেলে সুরেশ! না—এ অনুগ্রহ সে সহ্য করবে না। কে সুরেশকে বলেছিলো তার পক্ষের উকিল হতে? আচ্ছা ও সুরেশ কি? না হলেও তো হতে পারে। কিন্তু ঐ গলা, ঐ রকম কথা বলার ভঙ্গী, তার ওপর হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করে বললে! না, ও সুরেশই—দীননাথ ভাবতে লাগলো সুরেশ কি তাহলে তাকে ভালোবাসে না কর্তব্য করার জন্যেই সে তার বাবাকে বাঁচাতে এসেছে! যদি তাই হয়, সে চায় না তার সাহায্য, চায় না তার অনুকম্পা! দীননাথ হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে বললে, না এ হবে না!

রাজলক্ষ্মী রান্না ছেড়ে উঠে এসে বল্‌লেন, কি হবে না ?

দীননাথ আবার শুয়ে পড়লো। বল্‌লে, না কিছু না। গিন্নি আমায় কে একজন যেনো অপমান করবার চেষ্টা করছে !

রাজলক্ষ্মী প্রশ্ন করলেন, কে ?

দীননাথ মাথা নাড়তে নাড়তে বল্‌লে, তা জানি না—

দীননাথের বটবৃক্ষতলায় আসার পূর্বে, যখন আদালতে শুনানী চলছিলো, তখন বটবৃক্ষতলার আশে পাশে এক মজার ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো। রাজলক্ষ্মী রান্না করছিলেন ; রেখা পাশের পুকুর থেকে খাবার জল কলসীতে নিয়ে ফিরছিলো। কলসী করে জল আনা তার অভ্যেস নেই সুতরাং সে অতিকষ্টে টেনে হিঁচড়ে কলসীটাকে নিয়ে চলেছিলো। রাজলক্ষ্মী দেখ্‌লেন রেখা সেই-দিকেই আসছে। তিনি পশুকে বল্‌লেন, বেচারী—হয়তো সহরের কোনো বড়লোকের মেয়ে, গ্রামে বিয়ে হয়েছে ;—জানে না কি করে কলসী ধরতে হয়।

রেখা আর খানিকদূর আস্‌তে না আস্‌তেই কলসী নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি গেলেন রেখার কাছে, বল্‌লেন, আহা, হাতে লেগেছে মা ?

রেখা ঘাড় নেড়ে জানাতে চাইলে তার লাগেনি কিন্তু চোখ তখন তার জলে প্রায় ভরে এসেছে। রাজলক্ষ্মী ফের বল্‌লেন, জান না বুঝি কি করে কলসী ভরে জল আনতে হয় ?

রেখা উত্তর দেবার আগে রাজলক্ষ্মী নিজের কাঁখে কলসীটা বসিয়ে দেখিয়ে দিলেন কেমন করে কলসী কাঁখে করতে হয়।

তারপর বল্‌লেন, বুঝলে ?

—হ্যাঁ। এবার দিন আমায়—

রাজলক্ষ্মী একটু হেসে বল্‌লেন, চলো একটু এগিয়ে দিই তোমায়! তিনি সামান্য এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় বাড়ী তোমার?

রেখা আঙুল দিয়ে একখানা বাড়ী দেখিয়ে বললে, ঐদিকে ঐ ভূতের বাড়ী—

—ভূত আবার কি?

—ভূত নেই?

রাজলক্ষ্মী বললেন, না!

রেখা ছেলেমানুষের মত বল্‌লে, তবে, ওযে বলে—

রাজলক্ষ্মী মধুরভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, তোমায় ভয় দেখাবার জন্যে বলে।

রেখা বিজ্ঞের মতো বল্‌লে, ও এবার বুঝেছি। আর আমি ভয় খাবো না, কিছুতেই ভয় খাবো না। বলে ঘাসের দিকে দৃষ্টি পড়তে সে শিউরে উঠলো। একেবারে ভয়ে চীৎকার করে রাজলক্ষ্মীর বুকের সঙ্গে মিশিয়ে গেলো।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলেন, কি? কি হয়েছে মা?

রেখা ভয়ে ভয়ে দেখালে, উই যে—

রাজলক্ষ্মী দেখলেন খড়ের ওপর গোটাকতক আরসুলো। তিনি পশুকে ডেকে সেগুলো মেরে ফেলতে বললেন। পশু দু' একটাকে হাতে তুলে নিয়ে হিঁ হিঁ করে হাসতে লাগলো।

রেখা আস্তে আস্তে বল্‌লে, মা!

রাজলক্ষ্মী তার মাথায় হাত রেখে বল্‌লেন, ভয় কি, নিয়ে গেছে।

একটু পরে দীননাথের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। রাজলক্ষ্মী বল্‌লেন, ঐ আস্‌ছেন—

—কে ?

—আমার স্বামী। আদালতে মকর্দমা আছে, তাই আমরা এসেছি মা।

একটু পরে দীননাথ এসে পড়লো রসিকলালকে সঙ্গে নিয়ে।

রাজলক্ষ্মী মাথায় আঁচল টেনে দিলেন। রেখা দীননাথকে চিন্‌তে পারলে। তবুও সে বললে, কে উনি ?

—আমার স্বামী !

রেখা তৎক্ষণাৎ রাজলক্ষ্মীর পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে ডাকলে, মা !

রাজলক্ষ্মী একটু অবাক হয়ে বল্‌লেন, প্রণাম কেন মা ?

রেখা সলজ্জভাবে বল্‌লে, এমনি। রেখা চলে গেল কলসী নিয়ে।

*

রেখা কলসীতে করে জল নিয়ে বাড়ী ফিরে দেখলে সুরেশ একাগ্রমনে কি চিন্তা করছে বসে বসে। তার পরণে তখনো আদালতের পোষাক।

রেখা কলসী কাঁখে নিয়েই দাঁড়িয়ে বললে, কি ভাবছো ? আইন আদালতের কথা, না প্রিয়তমা পত্নীর কথা ?

সুরেশ একবার তার দিকে চেয়ে আবার ভাবতে লাগলো।

রেখা কলসীটা মাটিতে রেখে কাছে সরে এসে বল্‌লে, হঠাৎ ওকালতী সুরু হলো যে !

সুরেশ বল্লে, আমার কাজের কৈফিয়ত নেবার জন্যে তোমায় বিবাহ করিনি!

রেখা মিষ্টি হাসি হেসে বললে, ওরে, তাই নাকি?

সুরেশ আবার তার দিকে একবার চাইলে। রেখা বললে, তা এই মক্কেলটি কে? কোনো চেনা লোক নাকি?

সুরেশ যেনো বিরক্ত হয়েছে, এরকম ভাবে বল্লে, আচ্ছা, তোমার কি কাজ নেই রেখা?

রেখা ফিক্ করে হেসে বল্লে, যাক্ তবু একবার নাম ধরে ডেকেছো!

সুরেশ ফিরে দেখলে না তার দিকে।

রেখা আবার বললে, কি গো চেনা লোক নাকি?

সুরেশ আগ্রহভরে বল্লে, তুমি শুনেছো কিছু—

রেখা বললে, সব শুনেছি। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হলো—

সুরেশ রেখাকে সংশোধন করে দিতে গেলো, আমার মা তোমার মা—

রেখা ধীরভাবে বল্লে, আজ্ঞে না মশাই, ভাইবোনে বিবাহটি প্রাচীন মিশরেই হতো এদেশে নয়। আপনার মা আমার শাশুরীই হওয়া উচিৎ, মা নয়।

সুরেশ ব্যস্তভাবে বল্লে, তুমি মাকে তোমার পরিচয় দিয়েছো নাকি?

রেখা ঠোঁট উল্টে বল্লে, ইস্ পরিচয় দেবে! আমার লজ্জা করে না! ঐ তো শাশুড়ী, পাড়াগেঁয়ে— কটকটে কথা, এদিকে আবার কেমন করে কলসী ভরে জল আনতে হয় তাও

জানে না ;—আমি দেখিয়ে দিলাম। ঐ তো শাশুড়ী, আর ঐ তো শ্বশুর—খুনে আসামী—

স্বরেশ জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, রেখা!

রেখা সহজ কণ্ঠে বল্লে, ওরে বাবা, শ্বশুরের ছেলে যে খুনে হয়ে উঠলো রে—

স্বরেশ বিষণ্ণ মুখে বল্তে লাগলো, রেখা আমার বাবা নির্দোষ! তিনি যদি কাউকে আঘাত করে থাকেন সে আমার জন্যে—আমায় ভালোবাসেন বলে।

রেখা স্বরেশের কথা শেষ হতে মুখভঙ্গী করে বল্লে, বাবা, তোমাদের দেশে কি একজনকে ভালোবাসলে আর একজনকে ঠেঙ্গাতে হয় নাকি? তা পিতা-পুত্রে এতো যুদ্ধবিগ্রহ কেন বাপু! ঐ তো বাগানের ওপারে তোমার বাবা রয়েছে, মা রয়েছে, যাওনা ঘরের ছেলে ঘরে,—আমিও চলে যাই।

স্বরেশ কথাটা ঠিক না বুঝতে পেরে বল্লে, কোথায় যাবে তুমি?

—আমার বাবার কাছে—আমার বাড়ীতে!

স্বরেশ বল্লে, কখনো না কোনোদিনই না—

রেখা জিদ দেখাবার ভাণ করে বল্লে, ইস্ নিশ্চয়ই যাবো; —হয় আজ, নয় কাল, নয় পরশু, নয় তরশু আর না হয় তো খরশু। আর আমি কিছুই ভয় করি না। তোমাকেও না, ভূতকেও না আর আরশুলাকেও না, বুঝলে মশাই? বলে রেখা চলে গেলো ভাঁড়ার ঘরে কলসী রাখতে।

শোবার সময় স্বরেশ বললে, জান না রেখা, বাবা বড় এক-রোখা, উনি আমায় কোনোদিন ক্ষমা করবেন না।

—এ তোমার বাবার বড় অন্যায় !

সুরেশ জবাব দিলে, বাবা মনে করেছেন, আমি বুঝি টাকার লোভে তোমাকে বিয়ে করেছি কিন্তু তা তো সত্যি নয় ! আমি তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য একাজ করেছিলাম !

রেখা সুরেশের গালের ওপর একখানা হাত রেখে বললে, ও, এইজন্যেই বিয়ে করেছিলে ? তবে আর আমার থাকার দরকার ?

সুরেশ রেখাকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, আমরা বদলে গেছি রেখা, এখন আমি-তুমি আগের মত নেই।

রেখা সুরেশের আলিঙ্গনে নিজেকে নিঃশেষে ছেড়ে দিলে। সুরেশ বললে, বাবার আশা ছিল তাঁর বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন—কিন্তু…

সুরেশের গলা বুজে এল। রেখা সুরেশের চোখের পাতায় আঙুল দিয়ে বললে, তুমি কাঁদছো ? তাহলে তোমার সঙ্গে আমার আড়ি। আমি ওরকম ঘ্যানঘ্যান করা ভালোবাসি না।

সুরেশ কোনো উত্তর দিলে না। সে কেবল আদালতে দণ্ডায়মান দীননাথের কথা মনে করতে লাগলো।

রেখা তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো !

দ্বিতীয় দিনের শুনানী আরম্ভ হলো। আসামীপক্ষের উকিল সুরেশ প্রাণকেষ্টোকে ক্রস্ করছিলো। প্রাণকেষ্টোর মাথার চারিধারে তখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। প্রাণকেষ্টো সুরেশের প্রশ্নে খেই হারিয়ে ফেলতে লাগলো। বললে, হুজুর সত্যি কথা বলবো কি করে? আসামীর উকিলমশায় যে রকম ভয় খাইয়ে দিচ্ছেন, সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে—

সুরেশ প্রাণকেষ্টোকে জিজ্ঞাসা করলে, আসামী যখনই যাত্রা-দলে থাকেন, তুমি আর ভালো Post পাওনা, না?

প্রাণকেষ্টো দুঃখেতে গলে গিয়ে বললে, কি করে পাবো? যেদিন দীননাথ থাকবে, সেই দিনই অধিকারী বলবে—পরাণকেষ্টো গোঁফদাড়ী খুলে ফেলো, জটা খুলে দাও—জিজ্ঞেস করো না অধিকারীকে—

বলে সে সম্মুখে উপবিষ্ট রসিকলালকে দেখালে।

সুরেশ বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের একটা আঙুল ঠুকে বললে, ঠিক। তাহলে আসামী যাত্রার দলে এলেই তোমার খুব ক্ষতি হয় বলো!

প্রাণকেষ্টো মনের কথা খুলে বললে, ক্ষতি নয়! বিশবছর যাত্রা করছি—সেই মাসে তেরো টাকা থেকে উনিশ টাকা বারো আনা হয়েছে! দীননাথের পার্টটা পেলে রোজ পিছু তবু পাঁচ-টাকা বেশী পাই।

সুরেশ বুঝতে পারলে প্রাণকেষ্টো নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা

দিচ্ছে। সে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার প্রশ্ন আরম্ভ করলে, তাহলে তো দেখছি, এ ঘোর শত্রুতা।

প্রাণকেষ্টো বললো, নিশ্চয়ই। শত্রুতা নয়! তাইতো বলেছি শত্রুতা করেই তো হাতুড়ী ছুঁড়লে—

—হাতুড়ীর কথা পরে হবে। শত্রুতা তুমি স্বীকার করছো, আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু শত্রুতাটা কার? আসামীর তোমার প্রতি না তোমার আসামীর প্রতি? যার ক্ষতি হয় তারই নিশ্চয় শত্রুভাব!

প্রাণকেষ্টো ঘাড় নেড়ে জানালে, এজ্ঞে। ইঃ, এই দেখুন হুজুর, আবার সব ঘুলিয়ে দিচ্ছেন ইনি!

সমস্ত আদালত শুদ্ধ লোক হেসে উঠলো।

এস্-ডি-ও বললেন, order, order!

এই সময় রায়বাহাদুর শশিশেখরকে নিয়ে আদালত বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। শশিশেখর রায়বাহাদুরকে একটু এগিয়ে বসতে বলায়, রায়বাহাদুর বললেন, না, আমি একটু আড়ালেই থাকতে চাই!

শশিশেখর বললেন, বেশ কথা। তাঁরা দূরে একখানা বেঞ্চিতে বস্‌লেন। শশিশেখর একটা বিড়ি ধরাতে যেতে পুলিশ বলে উঠলো, এই?

শশিশেখর বললেন, ভুল হয়েছে বাবা. তারা মা, দুষ্টদলনী!

—কেয়া বোলা?

—কিছু নয় বাবা;—মাকে ডাকৃতা হায়। উয়ো জগৎমাতা হায়—দুষ্টকে দলন করতা হায়!

সুরেশ বলছিলো your Honour, আপনি সমস্ত শুনলেন।

আসামীর যদি কোনো অপরাধ থাকে তাহলে সে অপরাধ তাঁর অপরিসীম পুত্রস্নেহ। ফরিয়াদী যদি আসামীকে ধরে মারতো, তাহলেও আসামীর হাত থেকে হাতুড়ী ছিটকে যেতো না; কিন্তু ফরিয়াদী অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে, অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাষায় আসামীকে তাঁর ছেলের কথা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলো। তাঁর ছেলেকে ছোট কথায় গাল দিয়েছিলো। তাই…

দীননাথ সুরেশের কথায় বাধা দিয়ে আসামীর কাঠগড়া থেকে বললে, তাতে কি হয়েছে! ছেলের জন্যে আমি প্রাণকেষ্টোকে হাতুড়ী ছুঁড়ে মেরে ছিলাম? ছেলের মান রাখতে ছেলেকে ভালবাসি বলে? কখনও না। হুজুর, উকিলবাবু আমার মনের কথা কি জানতেন?

এস্-ডি-ও হাঁকলেন, চুপ করো তুমি!

দীননাথ তবু চুপ করলে না, বলতে লাগলো—না হুজুর আমি চুপ করলে এই আদালতে, এই ধর্মের স্থানে সবই মিথ্যা প্রচার হয়ে যাবে। আপনি দয়া করে শুনুন, আমি অন্ধ হতে পারি কিন্তু পুত্রস্নেহে আমি অন্ধ নই;—ছেলের মান বাড়াবার অভিমান নেই আমার—প্রাণকেষ্টোকে আমি মেরেছিলাম—ওর ওপর রাগ ছিল অনেকদিনের, তাই।

এস-ডি-ও বললেন, প্রাণকেষ্টোর উপর তোমার রাগ তো দেখছি না—এই উকিলবাবুর উপর তোমার যত রাগ।

দীননাথ বললে, আজ্ঞে না, উকিলবাবুর উপর আমার কোন রাগ নেই;—কিছু নেই ওর উপর আমার—

এস-ডি-ও বুদ্ধিমানের মতো বললেন, কিন্তু উনি তোমায় বাঁচান, এটা তোমার ইচ্ছা নয় দেখছি। তুমি যেন শাস্তি পেতেই

চাও। কিন্তু জানো তুমি, আত্মঘাতী হবার যে চেষ্টা করে আদালত তাকে শাস্তি দেয়!

দীননাথের স্বর শোনা গেলো, কান্নায় ভেজা,—কিন্তু হুজুর, জনার্দন যে আত্মঘাতী হলো তার শাস্তি কে পাবে! সে তো আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে কিন্তু যার জন্যে সে আত্মঘাতী হলো তাকে তো কেউ শাস্তি দিলে না হুজুর! সে তো এখন ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঐ উকিলবাবু—ঐ সুরেশ। ঐ তো জনার্দনকে হত্যা করেছে—আমি ওকে ক্ষমা করবো না—ওর দয়ায় আমি বাঁচতে চাই না, না, না।

দীননাথ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

এস-ডি-ও বললেন, চুপ করো তুমি। ও সবের সঙ্গে এ-মামলার কোনো যোগ নেই। সুরেশবাবু—

—your Honour!

—কালীবাবু!

—হুজুর—

—আমায় দিনকতকের জন্যে টুরে যেতে হবে। এ মামলার রায় আমি আজই দিয়ে যেতে চাই লাঞ্চের পর!

*

আদালতে যখন বিচার চলছিল তখন রেখা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কথা কইছিলো।

আপনি আজ রান্না চাপান নি মা?

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিলেন, আজ আমি বড় ক্লান্ত মা। এসো, আমার পাশে বসবে এসো।

রেখা রাজলক্ষ্মীর পাশে এসে বস্‌লো। রাজলক্ষ্মী রেখার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে, কাল তোমায় বলেছিলাম, ঐ আদালতে আমার স্বামীর বিচার হচ্ছে—আজও সেই বিচার হচ্ছে।

—বিচার কি! আপনার স্বামী তো নির্দোষ!

—নির্দোষ তো বটেই—কিন্তু ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা যা তিনি যে নির্দোষ, সেইটে প্রমাণ করতে হচ্ছে আমারই একমাত্র ছেলেকে আদালতে দাঁড়িয়ে—দশজন সাক্ষী ডেকে—!

রেখা কোমলস্বরে বললে, এতক্ষণে বিচার শেষ হয়ে গেছে—এইবার আপনার স্বামী, আপনার ছেলে আপনার কাছে চলে আসবেন—

রাজলক্ষ্মী তাঁর দুঃখ জানালেন, তুমি সব জানো না মা—দেবতার মত স্বামী আমার, দেবকুমারের মতো ছেলে। উনি সুরেশ বলতে অজ্ঞান, সুরেশ বাপের জন্যে প্রাণ দিতে পারে, অথচ—

রেখা ডাক্‌লে মা!

রাজলক্ষ্মীর চোখ দিয়ে তখন অবিরলধারায় অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

আবার রেখা ডাক্‌লে, মা!

রাজলক্ষ্মী পূর্বের জের টেনে চল্‌লেন, অথচ আজ কমাস হলো মা, বাপ-ছেলের দেখা দেখি নেই, কথা নেই। অন্তরের যুদ্ধে দুজনই ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো, অথচ দুর্জয় অভিমান অভিশাপের মতো মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুজনকে দিন দিন আরও তফাতে নিয়ে যাচ্ছে—আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখছি! কিছুই করতে পারছি না—

রেখা জিজ্ঞাসা করলে, কেন এমন হলো মা? আপনার ছেলে কলকাতায় সেই দুষ্টু মেয়েটিকে বিয়ে করেছে, সেইজন্যেই কি এইসব মা?

রেখা রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো—কিন্তু কি বল্‌বেন রাজলক্ষ্মী? তিনি একটু মাথা নেড়ে জানালেন, না মা, তার কি অপরাধ? অপরাধ এই কপালের!

বলে তিনি কাঁদতে লাগ্‌লেন। রেখা তাঁকে সহানুভূতি জানালে। তারপর জলের কলসীটি কোমরে নিয়ে বাড়ীর পথে পা দিলে।

রাজলক্ষ্মী তার যাবার পথে চেয়ে রইলেন—

*

লাঞ্চের পর এস্‌-ডি ও জানালেন, আসামী বেকসুর খালাস! **acquitted immediately**!

সমস্ত আদালত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। রসিকলাল দীননাথকে ধরে আনন্দে উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে, দীনু দীনু, মান্‌ছি তোমার ছেলে, **Highcourt** এর উকিল বটে—এ একেবারে ডবল হাইকোর্ট—

দীননাথ তার কথা শুনেও শুন্‌লে না, তার কেবল মনের মধ্যে ঘুরপাক্‌ খেতে লাগ্‌লো একটা কথা—আজ তাকে বাঁচালে কে? সে তো জানে, সে কে! সে, সুরেশ! তার ছেলে! দীননাথ প্রায় কেঁদে ফেলেছিলো আর কি! সে নিজেকে শতধিক্কার দিতে লাগলো, ছিঃ ছিঃ শেষে সুরেশ তাকে বাঁচালো! এ যে অনুগ্রহ, অনুকম্পা! সুরেশ কি তাকে ভালবেসে একাজ

করেছে? এই হলো তার প্রশ্ন—তার কোনো উত্তরই পেলে না সে—

রসিকের সঙ্গে দীননাথ হাঁটতে হাঁটতে এইসব চিন্তা করতে লাগ্‌লো।

রায়বাহাদুর একটু দূরে থেকে বিচার দেখছিলেন। শশিশেখর বিচার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, চলুন রায়বাহাদুর, জামাই বাবাজীর সঙ্গে একটা shake hand করে আসা যাক্।

রায়বাহাদুর জানালেন, না—আমি গোপনে থাক্‌তে চাই—

—বেশ কথা! তাঁরা অন্য পথ ধরলেন।

*

দীননাথ রসিকের সঙ্গে হেঁটে চল্‌লো।

রসিক বল্‌লে, তোমার গাড়ী কোথায় রাখতে বলেছো?

—ওই যে ওই বাগানে—তুমি তো জানো হে—

দীননাথ বাগানে ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময় সুরেশ ডাকলে, বাবা! দীননাথ সাড়া দিলে না।

—বাবা!

দীননাথ রসিককে বল্‌লে, রসিক, চলো চলো, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

রসিক বল্‌লে, দীননাথ, তোমার ছেলে উকিলবাবু তোমায় ডাক্‌ছে—

দীননাথ কঠোরভাবে বল্‌লে, না, কেউ নয়—

তারা সুরেশকে রাস্তায় পাথরের মত দাঁড় করিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে গেলো।

সুরেশের চোখে জল এলো। আপন মনে বললে, তার বাবা

তাকে এতটুকুও ভালবাসেন না? বল্লেন—আমার কেউ নয়! এ কি অভিমান, না অভিশাপ?

সুরেশ দ্রুত হেঁটে চল্লো বাড়ীর দিকে। সে নিজের মন বিশ্লেষণ করে দেখলে, সে যা-কিছু করেছে সে তার বাবাকে ভালবাসে বলেই করেছে! কিন্তু…

সুরেশ একটা মাটির ঢেলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সামলে নিয়ে আবার হেঁটে চল্লো। কেন, কেন বাবা তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন? একসময় তার মায়ের ওপরও অভিমান হলো। মাও কি বাবার দলে? না, না—মা সে রকম নন! মা নিশ্চয়ই বসে আছেন, কখন সে ফিরে যাবে তাঁর কোলে সেই আশায়।

সুরেশ আরও জোরে পা চালালে। এই পৃথিবীতে তার কেউ নেই—কেউ নেই—বাবা—মা—কেউ নেই? তাঁরা তাকে পরিত্যাগ করেছেন! সুরেশ রুমাল দিয়ে চোখ মুছলে! ছোট ছেলের মতো সে ফুঁপিয়ে উঠলো।

তার সামনে এক মুহূর্ত্তের জন্যে জগৎটা ফাঁকা মনে হলো—যেন সব তার হারিয়ে গেছে, যেন এ-পৃথিবীতে তার আর বেঁচে থেকে দরকার নেই!…

দূর থেকে তার বাড়ী দেখা গেলো। সুরেশ ভাবতে লাগলো, তার সংসার, ছোট্ট সংসার—সে তো বাবা-মাকে ছাড়াও হতে পারে—পারে না? নাই বা রইলো বাবা, নাই বা রইলো মা—শুধু সে আর রেখা—রেখা আর সে—তার রেখা তাকে আপন করে নেবে না?

সুরেশ বাড়ী ঢুকে কাতরস্বরে বল্লে, রেখা, রেখা, আমি

তোমার কাছে ফিরে এসেছি, রেখা, আমার আর কেউ নেই—তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না···

সুরেশ ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলে দরজা বন্ধ। সেই সময়, জানলা খুলে জগন্নাথ মুখ বাড়িয়ে বললে, সেই, পাঁলিয়েঁছে—

—কে পালিয়েছে, কোথায় ?

জগন্নাথ বল্‌লে আঁপনার বঁউ। পালিয়েঁছে—

সুরেশ ধম্‌কে বল্‌লে, কোথায় পালিয়েছে হতভাগা ?

—আবার কোঁথায় ? বাপের বাড়ীতে—ওর বাবাকে আমি চিনি—বালিগঞ্জের রায়বাহাদুর। সকালে দেখলাম ঐ দিকে ঘুরে বেঁড়াচ্ছে—ওঁই মেয়েকে নিয়ে গেছে। আপনার বঁউ আমাকে ঘরে আট্‌কে গেছে—বের ক‌রে দিন উঁকিলবাবু আমায়—

সুরেশ তার কোনো কথা শুনলে না। সে বলে উঠলো, কখনো না, আমি নিয়ে যেতে দেবো না রেখাকে—রেখা—

সুরেশ চলে গেলো ঝড়ের বেগে। জগন্নাথ ঘরে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে ডাকলে, আমায় ফেলে গেলেন কেন উঁকিলবাবু—ওঁ উঁকিলবাবু···

সুরেশ পাগলের মতো ছুটে চললো। সৌভাগ্যবশত সে একখানা ট্যাক্সি দেখ্‌তে পেলো। জিজ্ঞাসা করলে ট্যাক্সি-চালককে—কোনো মেয়েকে এখান দিয়ে যেতে দেখেছো ?

—হ্যাঁ, ওই জলার দিকের রাস্তায় বাবু ;—একটি বড় ঘরের মেয়ে—

সুরেশ গাড়ীতে উঠে বসে বল্‌লে, তুমি খুব জোরে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে চলো আমাকে—যা চাও তোমায় তাই দেবো—

গাড়ী উড়ে চল্‌লো—

—বারো—

বেলা প্রায় তিনটে। রৌদ্র বিশেষ নেই—আকাশটা মেবলা মেঘলা। গ্রামের রাঙা মাটির পথে চলেছে একখানি গরুর গাড়ী,—আশে পাশে, দূরে কেবল ধূ-ধূ মাঠ—মাঠের পর মাঠ—তার শেষ নেই! কোথাও কোথাও কতকগুলো কুটির দল বেঁধে রয়েছে।

গরুর গাড়ীর মধ্যে বসে রয়েছেন রাজলক্ষ্মী এবং দীননাথ। পশু গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছে। রাজলক্ষ্মী চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লেন, সুরেশকে নিয়ে এলে না?

দীননাথ জবাব দিলে, দরকার নেই!

রাজলক্ষ্মী বল্‌লেন, তুমি ডেকে পাঠাও, চলো ফিরে যাই—

—বাড়ীতে ফেরবার যদি তার ইচ্ছে থাক্‌তো, সে নিজেই আস্‌তো—সে চলে গেছে নিজের বাড়ীতে।

রাজলক্ষ্মী আজ প্রথম দীননাথের কথায় জোরে উত্তর দিলেন, কখনো না—

কিন্তু দীননাথ নির্বিকার। বল্‌লে, তবে তুমি ফিরে যাও, যদি তোমার ছেলে ফেরে তোমার কাছে, আমি চললাম। গিন্নি তুমি বড্ড বেশী কোমলপ্রাণ···ভাই···

গাড়ীর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে দীননাথের কথা ডুবে গেলো।

পশু হাঁকিয়ে চল্‌লে গাড়ী, বলদের পিঠে চাবুক মারতে মারতে—হেঁই—হাট—হেঁই-হাট—।

মাঠের পর মাঠ ফেলে এগিয়ে চল্‌লো গরুর গাড়ী।

রাজলক্ষ্মী পিছন ফিরে দেখতে লাগলেন গ্রামের পথ—যে পথ তিনি ফেলে এসেছেন। তাঁর মনে হলো—ঐ তো ঐ মাঠের পরেই সুরেশের বাড়ী! তাঁর সুরেশ, তাঁর ছেলে! অধীর কান্নায় তিনি ভেঙে পড়লেন। আহা বেচারী কত কষ্টই না পাচ্ছে! আর তার সঙ্গে দেখা হবে কি না কে জানে! তাঁর মনে হতে লাগ্‌লো, যেনো তিনি সুরেশকে ছেড়ে কতদূরে চলে যাচ্ছেন। তাঁর মুখ ফস্‌কে একবার বেরিয়েও গেল—সুরেশ!

দীননাথ বল্‌লো, কে?

রাজলক্ষ্মী বল্‌লেন, কেউ না।

—তবে সুরেশকে ডাক্‌লে?

—অমনি, মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো।

—রাজলক্ষ্মী কোনো কুটির দেখলেই ব্যথায় কাতর হয়ে পড়তে লাগলেন। ছোট্ট কুটির—ঠিক তাঁদেরই মতো কুটির—কত আশা, কত আনন্দ এর মধ্যে! ঘরভরা বাপ-মা-ভাই-বোন-বউ—এ যেন একটা স্বপ্ন! রাজলক্ষ্মী মনে মনে বল্‌লেন, আমারও যে সব ছিল ভগবান্, কিন্তু—কিন্তু কোথা গেলো! কে তাদের আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে?

তাঁর চোখ দিয়ে কেবলই জল ঝরতে লাগলো। পাশে চেয়ে দেখলেন দীননাথ বিছানায় মাথা দিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। তিনি একখানা পাখা নিয়ে দাননাথকে হাওয়া করতে লাগলেন।

হঠাৎ শুনতে পেলেন কে ডাকছে—মা!

রাজলক্ষ্মী বললেন, কে ডাকে?

দীননাথ পশুকে বললে, কেউ না, চালা পশু, তাড়াতাড়ি···

আবার সেই ডাক, মা! দাঁড়াও দাঁড়াও, গাড়ী থামাও!

রাজলক্ষ্মী এইবার পিছন ফিরে দেখলেন রেখা দৌড়ে দৌড়ে আস্‌ছে। বললেন, একি! সেই সুন্দর মেয়েটি যে। পশু—দাঁড়া—দাঁড়া—

দীননাথ বললো, কে?

রাজলক্ষ্মী বললেন, সেই যে, সেদিন যার কথা শুনে তুমি বললে, মা লক্ষ্মী—সে ছুটে আস্‌ছে—

রেখা দৌড়ে দৌড়ে এলো তাঁদের কাছে। গাড়ী তখন দাঁড়িয়ে পড়লো। রাজলক্ষ্মী তার হাতদুটি ধরলেন।

দীননাথ বললে, কি মা লক্ষ্মী, কি হয়েছে?

রেখা বললে, আপনারা ফিরে চলুন—

—ফিরে যাবো কোথায় মা?

—শহরে আপনার ছেলের বাড়ীতে। আমার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, আসুন—

দীননাথ অবাক্ হয়ে গেলো। বললে, কেন, আমার ছেলে পাঠিয়েছে তোমায়?

—না সে পাঠায় নি—!

দীননাথ প্রশ্ন করলে, তবে তুমি কেন এসেছো?

রেখা ধরা গলায় বললে, আমি তাদের বাড়ীর পাশে থাকি। আমি আপনার ছেলেকে চিনি—আমি জানি তিনি আপনাকে কত ভালোবাসেন—আপনি ফিরে চলুন···চলুন···

দীননাথ তার মাথায় হাত রেখে বল্‌লে, মা লক্ষ্মা—ফিরে যাও—আমার ছেলে যদি আমায় চাইতো, সে নিজে আস্‌তো—পশু চালা—

রেখা তবুও গেল না।

রাজলক্ষ্মী সজলচোখে বল্লেন, মা লক্ষ্মী, তুমি ফিরে যাও—

রেখা বল্লে, না আমি যাবো না, আমি যাবো না। আমি আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি; আপনাদের না নিয়ে ফিরবো না—

দীননাথ কোমল স্বরে বল্লে, তা কি করে হয় মা, তুমি যাও, তোমার কথা আমাদের চিরদিন মনে থাক্‌বে। পশু দেরি করিস নি, চল আমার শরীর বড় খারাপ মনে হচ্ছে···

রেখা উপায়ান্তর না দেখে গাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের কাঠখানা চেপে ধরে বলতে লাগ্‌লো, দাঁড়াও, দাঁড়াও। চালিয়ো না। উঃ দাঁড়াও!

দীননাথ বললে, পশু, ফেরাস নে ফেরাস নে।

রাস্তা এই ভাবে বন্ধ হয়ে গেলো! সরু রাস্তা—দূর থেকে একখানা মোটর এসে, সামনে আড়আড়ি ভাবে একখানা গাড়ী থাকার জন্যে একেবারে পাশের একটা গভীর জলায় গড়িয়ে গেল।

রাজলক্ষ্মী চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, ওরে পশু, একি করলি রে? বলে তিনি নেমে গেলেন তাড়াতাড়ি,—আহা, কাদের বাছারে···

কিন্তু সুরেশকে দেখে তিনি আঁতকে উঠলেন, একি, এ যে সুরেশ, আমার সুরেশ—

দীননাথ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, কে, কে?

পশু বললে, কর্তা, দাদাবাবু গাড়ীর তলায়—

দীননাথ মাতালের মতো টলতে টলতে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল—সুরেশ! কোথায় আমার সুরেশ! কই দাও তাকে আমার হাতে—কোথায়—

রাজলক্ষ্মী ও রেখাতে মিলে সুরেশকে দীননাথের কোলে

দিলে—বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগ্‌লো, সুরেশ, বাবা শুনছো, কোনো ভয় নেই—সুরেশ—!

সুরেশ শুধু বললে, বাবা! তার কপাল ও মাথা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে—

রাজলক্ষ্মী সুরেশের কপালের রক্ত মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, কোথায় লেগেছে বাবা—

সুরেশ ক্লিষ্ট স্বরে বললে, কোমরে—মাথায়···

দীননাথ তার মাথায় নিজের মুখ চেপে দিয়ে বললে, সব ভালো হয়ে যাবে, সব ভাল হয়ে যাবে। মা লক্ষ্মী আমাদের ফিরিয়ে এনেছে, কোথা তুমি, মা লক্ষ্মী!

রেখা এগিয়ে এসে দীননাথকে প্রণাম করলে।

সুরেশ বিস্মিত হয়ে বললে, রেখা!

রাজলক্ষ্মী বললেন, কে?

রেখা রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করলে, তারপর দীননাথের কাছে গিয়ে ডাকলে, বাবা!

দীননাথ বুঝ্‌তে পারলো। তার হৃদয় নেচে উঠ্‌লো—পেয়েছে সে তার পুত্র ও বধূকে। সে রেখাকেও নিজের কাছে টেনে নিলে।

সেই সময় আর একখানা মোটর এসে থাম্‌লো। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন রায়বাহাদুর, শশিশেখর ও জগন্নাথ। রায়বাহাদুর ডাকলেন, সুরেশ!

রাজলক্ষ্মী চিনতে পেরে বললেন, বেয়াই মশাই—

দীননাথ গদগদ গলায় বললে, আমি করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি—

—রায়বাহাদুর তার হাত ধরে বললেন, আমাকেই ক্ষমা

চাইবার অবকাশ দিলেন না। কিন্তু এখানে নয়, চলুন বাড়ীতে, আপনার বাড়ীতে।

শশিশেখর বললেন, রায়বাহাদুর এখনও একটু আড়ালে থাক্‌লে হতো না? জয় মা সর্ব্বমঙ্গলা, মঙ্গলে, মা!

জগন্নাথ বলে উঠলো, জয় মা! দিদিমণি আমি ফিরে এসেছি!

রেখা ফিক্ করে হেসে ফেল্‌লে। বললে, কি করে এলে তুমি!

জগন্নাথ বললে, রাঁয়বাহাদুর দরজা ভেঙ্গে বেঁর কঁরে এনেছেন—উঃ—কি কঁষ্ট!

রেখা তার জন্যে দুঃখ অনুভব করলে।

তারপর চললেন সবাই দীননাথের বাড়ীতে। সকলের বুকেই আনন্দের জোয়ার উছ্‌লে উঠ্‌চে।

*

তারপর……

সেদিন বাণীর বিয়ে।

বৃদ্ধ দীননাথের মুখে হাসি টলমল করছে। সানাই মিলন-রাত্রির রাগিনী আলাপ করছে। সুরেশ মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তার ঘরে খাটের ওপর বসে আছে আর ভাব্‌ছে কত কি আকাশ-পাতাল ভাবনা। সে ডাকলে, পশু পশু—

রেখা তখন ঘরে ঢুকে বললে, পশু নেই, মানুষ—

—ও, তুমি রেখা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই!

রেখা সুরেশের খাটের সামনে এসে দাঁড়ালো। সুরেশ বললে, আজ ভারি আনন্দের দিন, না রেখা।

হ্যাঁ, বাণীর বিয়ে, বর আসছে। সব ও বাড়ীতে। বাবা—মা, তোমার শ্বশুর মানে আমার বাবা, তান্ত্রিকঠাকুর, পশু-পক্ষী সব গেছেন…

সুরেশ বল্‌লে, তুমি যাওনি ?

—তোমাকে ফেলে ? রেখা একটু এগিয়ে এলো। বল্‌লে, তোমাকে একটা উপহার দেবো। চোখ বুঁজে, হাত পাতো—

—সে কি, উপহার দেবে ?

রেখা মুচ্‌কি হেসে বললে, তুমি চোখ বোঁজ না, পেলে বুঝতে পারবে।

সুরেশ চোখ বুঁজে হাত পাতলে, রেখা তার জামার ভিতর থেকে একটা কৌটা বের করলে, তারপর তার থেকে দুটো আরসুলা বের করে সুরেশের হাতের মুঠোয় ভরে দিলে।

সুরেশ চোখ খুলে বুঝতে পারলে রেখার দুষ্টামি। সে রেখাকে জোর করে বুকে টেনে নিয়ে বললে, দুষ্টু, তুমি এতো চালাক !

রেখা সুরেশের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভাণ করে বলতে লাগলো, ওরে, ছাড়ো, ওই দেখো, সব এসে পড়বে,—ওরে—

সুরেশ কিছুতেই ছাড়লে না তাকে। রেখা সুরেশের বুকের মাঝে মুখ গুঁজে বসে রইলো।

বাইরে থেকে শাঁখ বেজে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বর এসেছে, বর এসেছে ; জোরে শাখ বাজা…ইত্যাদি শব্দ ভেসে এলো।

সুরেশ রেখার মুখখানি তুলে ধরে বললে, এবার আর দুষ্টুমি করবে ?

রেখা মুখ না তুলেই ছেলেমানুষের মতো সুরেশের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, হ্যাঁ করবো, খুব করবো···

সানাই বেজে চললো মিলন রাগিনী গেয়ে—

শাঁখের শব্দে দীননাথের বাড়ী মুখরিত হোল।

শুধু দীননাথ একটু একলা পড়ে যেতে তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। সে মনে মনে ভাবলে সবই আছে কেবল নেই জনার্দন। দীননাথ তার আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথা নত করলে।